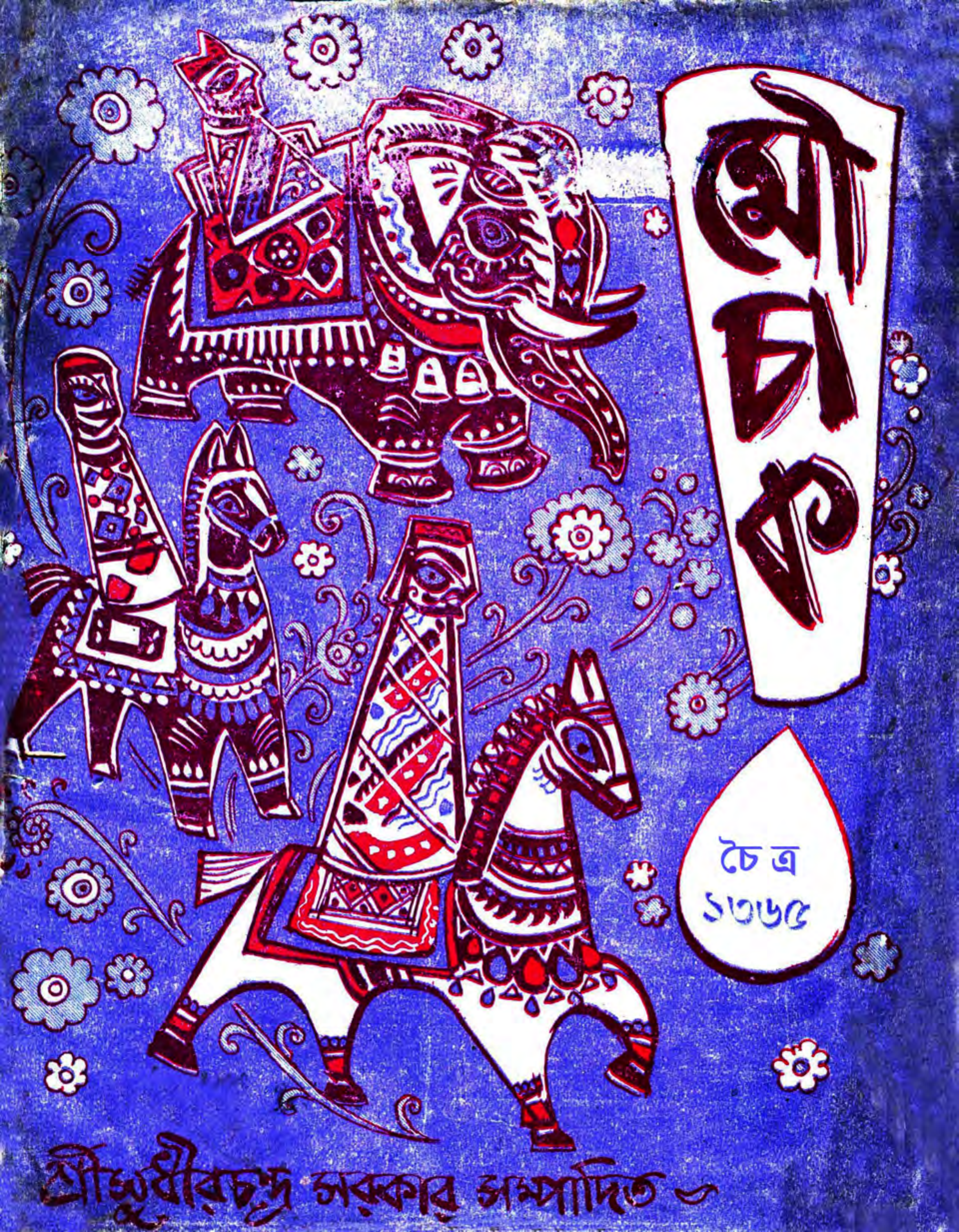
মৌচাক
চৈত্র
১৩৬৫
শ্রীসুধীরচন্দ্র সরকার সম্পাদিত

পত্রিকাটি ধুলো খেলায় প্রকাশের জন্য

হার্ডকপি : শুভাবতী চক্রবর্তী

স্ক্যান ও এডিট : সুজিত কুন্ডু

একটি আবেদন

আপনাদের কাছে যদি এরকমই কোনো পুরোনো আকর্ষণীয় পত্রিকা থাকে এবং আপনিও যদি আমাদের মতো এই মহান অভিযানের শরীক হতে চান, অনুগ্রহ করে নিচে দেওয়া ই-মেইল মারফত যোগাযোগ করুন।

e-mail : optifmcybertron@gmail.com; dhulokhela@gmail.com

পরিবর্তন

পূজোর ছুটির পরেই মিনি ফিরলো যখন দেশে,
কলকাতাতে এসে
চললো ছুটে পাশের বাড়ী, বিনী যেখানে আছে।
কী দেখেছে ছুটির ক'দিন বলবে সে তার কাছে—
ঝরনা পাহাড় মাঠের ধারে ফুলের রাশি ফোটে
ছোট্ট নদী নিরবধি বালুর চরে লোটে।
সকাল সাঁঝে বেড়িয়েছে সে কতই খুশী মনে
দল বেঁধে সব চড়ুইভাতি শালের বনে বনে।
হরেক রকম হৈ-হল্লা করলো সারা দিনই
বিনির কাছে আজকে গেলো বলতে সে সব মিনি!

দেখা হতেই মিনির সাথে বন্ধু বিনি বলে
অবাক্ কুতূহলে—
"ফিরলি তোরা কবে মিনি? সত্যি, ওমা! এ কি—
আজব ব্যাপার দেখি!
চেহারাটা বদলে গেছে,—স্বাস্থ্য গেছে ফিরে,
রঙের জলুস জোর বেড়েছে৷ ব্যাপারখানা কি রে?

মিনি বললে "খুব ঘুরেছি, ঝরনা নদীর লেকে
স্নান করেছি গা ধুয়েছি "মার্গো সাবান" মেখে।
রং হয়েছে ফর্সা তাতেই, স্বাস্থ্য হোলো ভালো—
শরীরটা তাই আমার আরও হয়েছে জমকালো!"
এই না বলে হাসলো মিনি, ঠোঁটের ফাঁকে ফাঁকে,
মুক্তো সম দাঁতগুলি তার ঝলতে যেন থাকে।
বিনি বললে, 'দাঁতগুলি সাফ করলি কি কৌশলে?'
মিনি বললে, 'নিম টুথপেষ্ট' ব্যাভার করার ফলে!

দি ক্যালকাটা কেমিক্যাল কোং লিঃ কর্তৃক প্রচারিত

খবর কি!
আখর গুলি হয় না কালো,
বলে না কেউ দেখলে ভালো,
সবাই শুধু ধমক লাগায়,
করব আমি কি ?
দোয়াত কলম ছিকেয় তুলে
ভাবতে বসেছি।
খোকন মনি, খোকন মনি,
ভাবছ বসে কি ?
ইস্কুলেতে হাতের লেখায়
শূন্যি পেয়েছি।
ভাবনা রাখো খোকন মনি
ভালো কালির খবর জানি,
কালির সেরা 'সুলেখা'তে
লেখাটি হয় কালো,
সেই কালিতে হাতের লেখা
লাগবে সবার ভালো।।
সুলেখা ওয়ার্কস লিমিটেড, সুলেখা পার্ক
কলিকাতা-৩২ হইতে প্রচারিত।

অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্তর

বীরেশ্বর বিবেকানন্দ

গৈরিকবসনে কি উজ্জ্বল রূপ দেখ একবার তাকিয়ে। মুণ্ডিতমস্তকে কি সৌম্য শোভা! কি উদাত্তশান্ত শঙ্খকণ্ঠ! বলিষ্ঠ, মোহমুক্ত, উর্জস্বী। অথচ শিবের মত সদানন্দ, পরিহাসমুখর। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন গ্রাজুয়েট, অথচ অপার-অগাধ বিদ্যা। ঋগ্বেদ থেকে রঘুবংশ মুখস্থ। বেদান্তদর্শন থেকে শুরু করে আধুনিক পাশ্চাত্ত্য দর্শন ও বিজ্ঞান নখদর্পণে। সমস্ত অন্ধতা ও অযুক্তির উপর খড়্গহস্ত। সমস্ত বন্ধন ছিন্ন করলেও এক ভালোবাসায় বন্দী। সে তার সুতীব্র দেশপ্রেম, জীবপ্রেম। বিদ্যুৎশিখার মত বাণী আর তীক্ষ্ণ অস্ত্রের মত তার অর্থ। সমস্ত কিছু মিলে উদ্বেল ঈশ্বর-উৎসাহ।

॥ প্রথম খণ্ড প্রকাশিত হইল ॥

মূল্য : পাঁচ টাকা

এম. সি. সরকার অ্যাণ্ড সন্স প্রাইভেট লিঃ ১৪, বঙ্কিম চাটুজ্যে স্ট্রীট, কলিকাতা-১২

কিশোর-সাহিত্যের অমর গ্রন্থ

অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর

মারুতির পুঁথি ৩।০

'বনফুল'

রঙ্গনা ২৲

বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়

হেসে যাও ২৲

পোনুর চিঠি ১৷।০

বিমল মিত্র

টক্-ঝাল-মিষ্টি ২৲

প্রতিভা বসু

সব চেয়ে যা বড় ১৷।০

বুদ্ধদেব বসু

রান্না থেকে কান্না ১।০

অ-কু-ব

খামখেয়ালী ছড়া ১ ০

পশুপতি ভট্টাচার্য

সুদূর দেশের রূপকথা ২৲

সীতা দেবী ও শান্তা দেবী

হিন্দুস্থানী উপকথা ৩।০

লীলা মজুমদার

হলদে পাখীর পালক ২৲

স্বপন বুড়ো

স্বপন বুড়োর মজার গল্প ১৷।০

শিবরাম চক্রবর্তী

নিখরচায় জলযোগ ১৷।০

রবীন্দ্র মৈত্র

মায়া বাঁশী ১৷।০

প্রত্যেকখানি বই ছবিতে ছাপায় অনবদ্য

নানা রঙের ছবিতে ভরা শিশু ও কিশোর-সাহিত্যে আর একখানি বিস্ময়কর প্রকাশ ভারত সরকারেরপুরস্কারপ্রাপ্ত

প্রেমেন্দ্র মিত্রের ঘনাদার গল্প ৩৲

ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েটেড পাবলিশিং কোং প্রাঃ লিঃ

৯৩, মহাত্মা গান্ধী রোড, কলিকাতা ৭

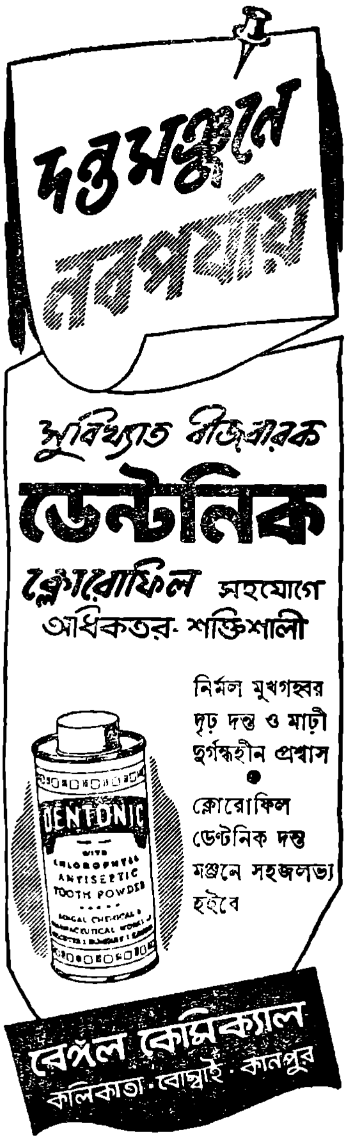

STATEMENT IN FROM IV AS REQUIRED BY RULES OF THE REGISTRATION OF NEWSPAPERS (Central) RULES, 1956

Name of the Newspaper—MAUCHAK

1. Place of Publication... 14, Bankim Chatterjee Street, Calcutta—12,
2 Periodicity of its publication... Monthly.
3. Printers' name... Sudhir Chandra Sarkar.
   Nationality... Indian.
   Address... 14, Bankim Chatterjee Street, Calcutta—12.
4. Editors' name... Sudhir Chandra Sarkar.
   Nationality... Indian.
   Address... ... 14, Bankim Chatterjee Street, Calcutta—12.
5. Names and addresses of individuls who own the newspaper and partners or shareholders holding more than one per cent of total capital.
   (a) Sri Sudhir Chandra Sarkar... 14, Bankim Chatterjee Street, Calcutta—12.
   (c) Sri Supriya Sarkar... 171/A, Lansdowne Road, Calcutta—26.

I Sudhir Chandra Sarkar, hereby declare that the particulars given above are true to the best of my knowledge and belief.

(Sd). Sudhir Chandra Sarkar.
Signature of Publisher

Date. 15. 3. 59.

পরীক্ষায় ভাল নম্বর পেতে হলে
ছাত্র ছাত্রীদের পক্ষে অপরিহার্য

শ্রীসরোজ কুমার দে প্রণীত

স্কুলপাঠ্য ইংরেজী ও বাংলা
সাহিত্যের অর্থ-পুস্তকই সর্বোৎকৃষ্ট

*শিক্ষক ও শিক্ষিকাগণেরও এই অভিমত।

*পুস্তকবিক্রেতা ও শিক্ষক মহোদয়গণকে উচ্চহারে কমিশন দেওয়া হয়।

*এতদ্ভিন্ন শহর ও মফঃস্বলের সমস্ত পুস্তকের দোকানে পাওয়া যায়।

প্রাপ্তিস্থান
স্কুল লাইব্রেরী
পুস্তক বিক্রেতা ও প্রকাশক
৬৪নং কলেজ ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১২

অ নু বা দ — সা হি ত্য

পৃথিবীর সংক্ষিপ্ত ইতিহাস

এইচ্. জি. ওয়েলস্

'এ শর্ট হিস্টরি অব্ দি ওয়ার্লড' গ্রন্থের পূর্ণাঙ্গ অনুবাদ। মূল গ্রন্থের কুড়িটি মানচিত্র সহ।

অনুবাদক সুনীলকুমার গঙ্গোপাধ্যায়, মনোজ ভট্টাচার্য।

৬·০০

কেটির কাণ্ড

সুসান কুলিজ

বিখ্যাত কিশোর-উপন্যাস 'হোয়াট কেটি ডিড'এর অনুবাদ। দুষ্টু মেয়ের অনেক দুষ্টুমির কাহিনী। অনুবাদ করেছেন বীরু চট্টোপাধ্যায়। ২·০০

এডগার অ্যালান পো-র গল্প

পূর্ণাঙ্গ অনুবাদ — নির্মলচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়। ২·৭৫

আ্যালেকজাণ্ডার ডুমার

কর্সিক্যান ব্রাদার্স ১·৫০

ব্ল্যাক টিউলিপ ১·৫০

হোয়াইট ফ্যাঙ

জ্যাক লণ্ডন

এ-শ্রেণীর কুকুরের গল্প পৃথিবীর যে-কোনো সাহিত্যে দুর্লভ। অনুবাদ করেছেন নির্মলচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়। ২·০০

জুল ভার্নএর দুটো বিশ্ববিখ্যাত বইয়ের অনুবাদ। অপূর্ব প্রচ্ছদে, অনুবাদের সৌকর্যে অনবদ্য

প্রতিটি ২·০০

অনুবাদক মানবেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

ফ্রম দি আর্থ টু দি মুন

এরাউণ্ড দি ওয়ার্লড ইন এইটি ডেজ

এইচ্. জি. ওয়েলসের

দি ফুড অব্ দি গডস

২·০০

দি ফার্স্ট মেন ইন দি মুন

২·০০

দি ওয়ার অব দি ওয়ার্ল্ডস

২·০০

লাফিং ম্যান ১·৫০

ভিক্টর হুগো

কলোদির

পিনোশিয়ো ১·৫০

অথই জলের রূপকথা

চার্লস কিংসলির বিশ্ববিখ্যাত রূপকথা 'দি ওয়াটার বেবীজ'-এর সুন্দর অনুবাদ। নোতুন নোতুন ছবি। ২য় সংস্করণ। অনুবাদক অমিয় চক্রবর্তী। ২·০০

আজব দেশে অমলা ১·৫০

হেমেন্দ্রকুমার রায়

'অ্যালিস ইন ওয়াণ্ডারল্যাণ্ড' অবলম্বনে রসোত্তীর্ণ অপূর্ব গ্রন্থ।

হোমারের

ইলিয়াড ১·০০

অডিসি ১·২৫

সোনালি নদীর রাজা ১·০০

রাস্কিন

হ্যানস্ অ্যাণ্ডারসেনের

বুনো হাঁসের দল

১·০০

সার্ভেন্টিসের

ডন কুইকজোট ১·২৫

বিদেশী গল্পগুচ্ছ

সম্পাদক অমিয়কুমার চক্রবর্তী

টলস্টয়, চেখভ্, সিনকেভিচ, আনাতোল ফ্রাঁস, বিয়র্নসন ইত্যাদির একটা করে গল্পের পূর্ণাঙ্গ অনুবাদ। ৩·৫০

অভ্যুদয় প্রকাশ-মন্দির ঃ ৬, বঙ্কিম চাটুজ্জে স্ট্রীট ঃ কলকাতা-১২

বাঘ-সাপ-ভূত

সম্বুদ্ধ

বিখ্যাত সাহিত্যিকের প্রথম ছোটদের বই। কয়েকটা বাঘের, সাপের আর ভূতের গল্প। ১·৫০

চারমূর্তি (নাটক)

নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়

বিখ্যাত উপন্যাসের নাট্যরূপ। যে কোনো উপলক্ষে অভিনয় জমাতে অদ্বিতীয়। ১·২৫

খুশির হাওয়া

নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়

মজার মজার গল্প। ২·০০

চারমূর্তি

নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়

(দ্বিতীয় সংস্করণ) ২·৫০

স্বপনবুড়োর রকমারি গল্প

১·২৫

ময়ূরকণ্ঠী বন

সুকুমার দে সরকার

পশুপাখিদের মনের কথা অভিজ্ঞ লেখকের এই অপূর্ব বইয়ে রূপায়িত হয়ে উঠেছে। ২·০০

ব্রহ্মদেশে ছয়মাস

রামনাথ বিশ্বাস

লেখকের ব্রহ্মদেশ-ভ্রমণ সম্পর্কিত একমাত্র পুস্তক। ২·০০

খেয়াল-খুশি

অসম্ভব

সম্পাদক অমিয়কুমার চক্রবর্তী। ত্রৈলোক্য, রবীন্দ্রনাথ, অবনীন্দ্র, সুকুমার রায় ইত্যাদির একটা করে আজগুবি গল্প। ৩·০০

হাল্‌কা হাসির গপ্প

সম্পাদক অমিয়কুমার চক্রবর্তী। বঙ্কিম, ত্রৈলোক্য, রবীন্দ্রনাথ, অবনীন্দ্রনাথ, সুকুমার রায়, হেমেন্দ্রকুমার, প্রেমেন্দ্র, অচিন্ত্য ইত্যাদি বত্রিশজন লেখকের একটা করে হাসির গল্প। ৩·৫০

সাতরাজ্যি

সুকুমার দে সরকার

খুকুর সাতরাজ্যি জয়ের অপরূপ কাহিনী। ১·৮০

মামাবাড়ি

অরবিন্দ গুহ

কয়েকটি অপূর্ব হাসির গল্প। ১·৫০

সোনার কাঠি ১·৫০

মণীন্দ্রলাল বসু

রঙীন হাসি

সুনির্মল বসু

যুক্তাক্ষর-বর্জিত ছড়ার বই। অসংখ্য ছবি, দু-রঙে ছাপা। ·৭৫

বনের গল্প

সুকুমার দে সরকার

কয়েকটি অনবদ্য জঙ্গলের গল্প। ১·৫০

শ্রেষ্ঠ সাহিত্যিকদের এক-একটি সঙ্কলন-গ্রন্থ এই সিরিজে প্রকাশিত হচ্ছে। এ পর্যন্ত বেরিয়েছে—

* হেমেন রায় * বনফুল * মানিক * বিভূতি বন্দ্যো * বুদ্ধদেব * তারাশঙ্কর * রবীন্দ্রলাল রায় * প্রেমেন্দ্র * অচিন্ত্য * মনোরঞ্জন ভট্টাঃ * শৈলজা * শরদিন্দু • শিবরাম * মোহনলাল * আশাপূর্ণা * লীলা মজুমদার * সৌরীন্দ্র * নারায়ণ • কামাক্ষী * জরাসন্ধ * সুকুমার দে সরকার।

প্রতি বই ২·০

সত্যিকার শার্লক হোমস

হেমেন্দ্রকুমার রায় ·৭৫

সুলুসাগরের ভুতুড়ে দেশ

হেমেন্দ্রকুমার রায়

দ্বিতীয় সংস্করণ। ১·৫০

বিশালগড়ের দুঃশাসন

হেমেন্দ্রকুমার রায়

(ড্রাকুলার কাহিনী অবলম্বনে) ২·০০

অভ্যুদয় প্রকাশ-মন্দির ঃ ৬, বঙ্কিম চাটুজ্জে স্ট্রীট ঃ কলকাতা-১২

আজ যে শিশু
কাল সে হবে
দেশের নেতা

আজ যে অসহায় শিশু একদিন তাকেই নিতে হবে দেশ শাসনের সুমহান দায়িত্ব। কাজেই শিশুদের সবল ও সুস্থ করে গড়ে তুলুন।

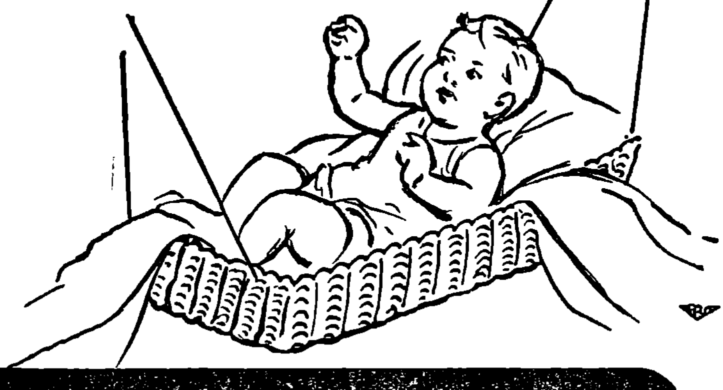

সাধনা বালামৃত

রুগ্ন ও শীর্ণ শিশুদের সুস্থ, সবল ও সুদৃঢ় করে গড়ে তোলে।

সাধনা ঔষধালয়, ঢাকা, ফার্মাসিউটিক্যাল ডিপার্টমেণ্ট, ৫৬, এস, কে, দেব রোড, কলিকাতা-২৮

চেয়ার-গাড়ী

ফটো ঃ পান্না সেন

৩৯ বর্ষ] চৈত্র—১৩৬৫ [১২শ সংখ্যা

একলার কান্নায়

শ্রীউমা রায়

ওদের ছেলে ঘরে
কেন—কেন এমন করে ?
কেন—এমন অধীর হ'য়ে
একলা কেঁদে মরে ?

আহা—একলা এখন
কেউই তো নেই কোথাও
যতই—কাছে দেখ এবং
যতই দূরে যাও !
সন্ধ্যাতারার টিপটি প'রে
জড়িয়ে আঁচলে
আকাশ কেমন চাঁদ নিয়েছে কোলে !

লতার বুকে ফুলটি দোলে
পাতার চুমায় পাঁপড়ি খোলে
পাখীরা ঐ জুটল বনের
ছায়ার নিটোলে।

বাতাস কেমন বইছে ধীরে
সঙ্গে ফুলের গন্ধ কি রে ?
দু'একটি গান দু'একটি তান
কোত্থেকে সে পেলে ?
একলা শুধু কেঁদে মরে
ওদের ঘরের ছেলে।

মা আছে ওর ? কোথায় গেছে ?
বলতে পারো তা কি ?
আলোর দেশে সুরের দেশে
উধাও হ'ল নাকি ?
আধেক আলো-ছায়—
শুন্‌ছে সে কি পরীদের গান
রূপালি পর্দায় !
মাঠের মধ্যে ব'সে
দেখছে সে কি উল্কা কেমন
আকাশ থেকে খসে ?
ক্ষুধার হাটে বিকায় যারা তাদের বেদনার,
নামিয়ে নিতে গেছে বুঝি একটুখানি ভার ?

কাঁদ্‌ছে কেন মানিক আমার
একলা ঘরের কোণে,
কেমন মা সে ধূলায় ফেলে
গেছে বুকের ধনে ?
ঝাপ্‌সা দু'চোখ জলে আকুল
কিসের খোঁজে দু'হাত ব্যাকুল—
মন বোঝেনা অবুঝ ছেলের কান্না ভেঙে পড়ে—
তরুণ তরু যেমন করে একটুখানি ঝড়ে।

জানালা দিয়ে হাওয়ার সোহাগ
ছড়িয়ে গেল চুলে,
শিষ দিয়ে গান শুনিয়ে গেল
ময়না আর বুল্‌বুলে।
রাত্রি এলো নরম পায়ে
শীতল করা হিমেল গায়ে
তলিয়ে গেল বিশ্বভুবন অন্ধকারের তলে,
ঘুমের হিমে ধূলায় শুধু একটি মাণিক জ্বলে।

কে আছ গো নাও তুলে নাও
বুকের পরে ওকে
এখনো ঠোঁট কাঁপছে দেখ
কান্না-ঝরা ঝোঁকে।
চুলগুলি ওর আঙুল দিয়ে
সমান করে দাও বুলিয়ে—
গালের পাশে জড়িয়ে গেছে চোখের জলে ভিজে
মেঝের ধুলোয় সারা গায়ে মাখল কাদা নিজে।

আঁচল দিয়ে গায়ের ধুলো
মুছিয়ে দিয়ে যাও—
একটু কালো কাজল-রেখা
চোখের কোলে দাও।
গুনগুনিয়ে গাও দু'টি গান,
স্বপ্নে ভরুক ঐটুকু প্রাণ—
বিছানা থাক ঘুমাক মাণিক বুকের নরমে—
একটি সুরের রেশের মত গানের চরমে।

———

বীরেশ্বর বিবেকানন্দ

অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত

(পূর্ব-প্রকাশিতের পর)

৬৬

সাতাশে সেপ্টেম্বর পর্যন্ত, টানা সতেরো দিন চলছে ধর্মমহাসভার অনুষ্ঠান—সকালে-বিকেলে, কখনো-কখনো দুপুরে। এবং প্রত্যহই কিছু-না-কিছু বলতে হচ্ছে স্বামীজিকে। না বলে উপায় কি! এমনি সব শুকনো জ্ঞানের কথা শুনে অতিষ্ঠ হচ্ছে শ্রোতারা, খানিক পরে-পরেই উঠে-উঠে যাচ্ছে, তাদের ধরে রাখা দুঃসাধ্য। তখন, সেই অবস্থায়, একটি মাত্র মন্ত্র আছে। বশীকরণের মন্ত্র। 'এর পর বিবেকানন্দ বলবে।'

এর পর বিবেকানন্দ বলবে। তবে আর কথা নেই। বসে যাও, যতক্ষণ না এ যন্ত্রণাটা শেষ হয় অপেক্ষা করো।

পোষাবে অপেক্ষা করা। কষ্টকঠিনের পরেই মধুমাধবী।

কি আনন্দময় বিবেকানন্দ! কি উজ্জ্বল গভীরস্পর্শ চোখ, কি হৃদয়গলানো গাঢ় কণ্ঠস্বর। মুখের হাসিটিতে বন্ধুতার গন্ধ! আর কি শুভ্রশুদ্ধ ইংরিজি। হয়তো বা কোথাও একটি পরিচ্ছন্ন আইরিশ সুর।

বিবেকানন্দকে শোনা মানে দেবতাকে শোনা। যেন প্রার্থনার মন্দিরে স্তব-মুগ্ধ হয়ে থাকা। আর কোনো দাবিতে নয়, বিবেকানন্দ যেন বলছে দৈবের দাবিতে। না শুনে তুমি যাবে কোথায়? কে তোমাকে ছুটি দেবে?

যেই বিবেকানন্দের বলা শেষ, অমনি প্রায় হল্ খালি। আর বসে থেকে কি হবে? আর কি শোনবার আছে? বিবেকানন্দ যদি বন্ধ হল, বন্ধ হল আনন্দের জলপ্রপাত।

কর্তাব্যক্তিরা বিব্রত হলেন। বিবেকানন্দের বলার পরে সভায় যদি আর লোক না থাকে তা হলে বিবেকানন্দকে সকলের শেষে বলতে বলো। আর সকলের বেলায় লোক থাকবেনা এ কেমনতরো কথা!

'আপনারা বসুন। স্থির হোন। বলবেন বিবেকানন্দ।' ঘোষণা করল কর্মকর্তারা।

'বলবেন? কখন বলবেন?'

'সকলের শেষে।'

'কতক্ষণ বলবেন?'

'পনেরো মিনিট।'

তাই সই। বসে যাও। পনেরো মিনিট শোনবার জন্যেই বসে যাব পাঁচ ঘণ্টা। পোষাবে বসে থাকা। পনেরো মিনিটই জীবনের রোমাঞ্চরুচির অভিজ্ঞতা। পনেরো বছর মনে থাকবে। যাবজ্জীবন মনে থাকবে।

সকলেই তো সত্য কথা বলছে, ধর্মের কথা আবার মিথ্যে হয় কি করে? কিন্তু বিবেকানন্দ যা বলছে তা পুঁথির সত্য নয়, জীবনের সত্য। পরীক্ষিত সত্য, উপলব্ধ সত্য। সে সত্য যেন তার ব্যক্তিত্বে উচ্চারিত। আর তার বাণী যেমনি সরল তেমনি পবিত্র। তার সমস্ত উপস্থিতিই যেন মঙ্গলের আলো। সুহাস বাসিত আশীর্বাদ।

'সমুদয় জগৎ ঈশ্বর দিয়ে আচ্ছাদন করো। জগতে যে সব অশুভ ও দুঃখ আছে তা উপেক্ষা করে নয়, সবই মঙ্গলময় সবই সুখময় এ ভ্রান্ত অলস ভাব অবলম্বন করেও নয়, প্রত্যেক সুখ-দুঃখ মঙ্গল-অমঙ্গলের মধ্যে সজ্ঞান সন্ধানে ঈশ্বরকে দর্শন করে। এই ভাবেই ত্যাগ করতে হবে সংসার—আর যদি সংসার একবার ত্যাগ হয়, বাকি কী থাকে? বাকি থাকে ঈশ্বর। একমাত্র ঈশ্বর। এই উপদেশের তাৎপর্য কি?' তাৎপর্য এই, তোমার স্ত্রী থাক তাতে কোনো ক্ষতি নেই, তাকে ছেড়ে চলে

যেতে হবে তার কোনো মানে নেই, কিন্তু ঐ স্ত্রীর মধ্যে দর্শন করো ঈশ্বরকে। সন্তান-সন্ততিকে ত্যাগ করো তার অর্থ কি? ওদের কি রাস্তায় ফেলে দিতে হবে? কখনোই না। ওদের মধ্যেও ঈশ্বরকে দেখ। অনন্তকাল ধরে প্রভুই একমাত্র বিদ্যমান। তিনিই স্ত্রীতে স্বামীতে সন্তানে, ভালোয় মন্দে, পাপে পাপীতে, হত্যাকারীতে। সবই সেই প্রভুর বস্তু। তোমার ভোগ্য ধনে তিনি, তোমার মনে যে বাসনা তাতেও তিনি। তুমি যদি তোমার বসনে ভূষণে তোমার বচনে মননে তোমার শরীরে ছায়ায় সর্বদ্রব্যে ঈশ্বরকে স্থাপন করো তা হলে জগতে কোথায় দুঃখ কোথায় ন্যূনতা কোথায় বিচ্যুতি? যে একত্বদর্শী তার আর মোহ কোথায়?'

আত্মত্যাগের উচ্ছ্বসিত বহ্নি। যৌবনের তেজস্বী উদ্ঘোষ। সমস্ত সংশয় ও সঙ্কীর্ণতার প্রত্যাখ্যান। কে প্রতিকূল্য করবে, দাঁড়াও সামনে, আমি সংগ্রামে অপরাঙ্মুখ। আমি একা আর সমস্ত পৃথিবী আমার বিরুদ্ধে। তাই সই, একাই লড়ে যাব খালি হাতে। ত্রিভুবনেশ্বরীর সন্তান হয়েও আমি পথের ভিখারী। আমার মরতে কী ভয়! আমি আমার প্রাণ উৎসর্গ করে যাব আমার ঈশ্বরের জন্যে, আমার পরাধীন দেশের নির্যাতিত অজ্ঞানগুহাবাসী দরিদ্রদের জন্যে।

এই অকপট সত্য প্রতিষ্ঠার কীর্তিমান মূর্তি বিবেকানন্দ।

এত তেজ এত বিশ্বাস এত উন্মুক্ততা এর আগে দেখেনি যেন আমেরিকা। এত সরল এত নির্মল এত বলবীর্যদৃপ্তও কেউ হয়!

পথে-ঘাটে চারদিকে ধ্বনিত হতে লাগল—বিবেকানন্দ, বিবেকানন্দ। পত্র-পত্রিকায় শুধু বিবেকানন্দের ছবি। শুধু পত্র-পত্রিকায় নয়, রাস্তার মোড়ে-মোড়ে টাঙানো হল বিবেকানন্দের পূর্ণাবয়ব প্রতিকৃতি। বড়-বড় অক্ষরে পরিচয় লেখা—সন্ন্যাসী বিবেকানন্দ। যে সামনে দিয়ে হেঁটে যায়, সে-ই স্তব্ধ হয়ে দাঁড়ায় খানিকক্ষণ, মাথা নত করে ভক্তিতে। দেহমনোময় ঈশ্বরসুরের উচ্ছ্বাসে।

মনে সঙ্কল্প করবে, বাক্যে উচ্চারণ করবে, কর্মে সুসিদ্ধ করবে। এই সেই সুসিদ্ধ মূর্তি। দেখ দেখ তার বিদ্যাপ্রদীপ্ত পৌরুষ। বিদ্যা কি? যার প্রভাবে ব্রহ্ম ও জীবের একত্ববিজ্ঞান অধিগত হয়, তাই বিদ্যা।

'কতগুলো ভুলচুক হয়ে গেছে বলে একেবারে বসে পোড়ো না। তাদের ফলও পরিণামে শুভই হবে। অন্যরূপ হতে পারেনা কেননা শিবত্ব ও বিশুদ্ধত্ব আমাদের প্রকৃতিসিদ্ধ ধর্ম। কোনো উপায়েই সেই প্রকৃতির ব্যত্যয় হয়না। আমাদের যথার্থ-রূপ সর্বদাই একরূপ।

জ্ঞানের আলো জ্বালো, এক মুহূর্তে সব অশুভ চলে যাবে। নিজের প্রকৃত স্বরূপকে প্রকাশ করো। অতি জঘন্য মানুষ দেখলে তার বাইরের দুর্বলতাকে লক্ষ্য কোরোনা, লক্ষ্য কোরো তার হৃদয়নিহিত ভগবানকে, আর তার নিন্দা না করে বোলো, হে স্বপ্রকাশক, হে জ্যোতির্ময়, ওঠো। হে সদাশুদ্ধস্বরূপ, হে সর্বশক্তিমান, হে অজ অবিনাশী, আত্মস্বরূপ প্রকাশ করো। তুমি যে ক্ষুদ্রতায় আবৃত আছ, আবদ্ধ আছ এ তোমাতে সাজেনা। তোমার মধ্যে যে অমিতশক্তি দৈত্য প্রসুপ্ত আছে তাকে জাগ্রত করো, শৃঙ্খলমুক্ত করো। অদ্বৈতবাদ এই শ্রেষ্ঠতম প্রার্থনারই উপদেশ। শুধু নিজরূপ স্মরণ করো, তার অর্থ শুধু সেই অন্তরস্থ ঈশ্বরকেই স্মরণ করো, সেই সদাশিব সদাশক্তি সদাশুদ্ধ পুরুষকে। যে মুহূর্তে আমি অদ্বৈতবাদী, সেই মুহূর্তে আমি মৃত। সেই মুহূর্তেই আমি আত্মা, আমি নিখিল বিশ্বের একেশ্বর সম্রাট। যদি রাজা পাগল হয়ে আপন দেশে 'রাজা কোথায়', 'রাজা কোথায়' বলে খুঁজে বেড়ায়, সে কখনো তার উদ্দেশ পাবেনা যেহেতু সে নিজেই রাজা। নিজেকে রাজস্বরূপ বলে জানো। জানো তোমার এ দারিদ্র্য সত্য নয়, এ বদ্ধতা সত্য নয়, এ খণ্ডতা সত্য নয়। যদি ঈশ্বর বলে কেউ থাকে সে তুমিই। তুমি যদি ঈশ্বর না হও, তাহলে ঈশ্বর কোনোদিন নেই, কোনোদিন হবেও না। আর যদি পাপ বলে কিছু থাকে, তবে এরূপ বলাই একমাত্র পাপ যে আমি দুর্বল বা অপরে দুর্বল।'

এই বুঝি হিন্দুর বেদান্ত। মুগ্ধ হয়ে বলাবলি করে সকলে। কি সুন্দর কথা! কি শাশ্বত সত্য কথা!

'বেদান্ত জগৎকে উড়িয়ে দেয়না, জগৎকে ব্যাখ্যা করে। ব্যক্তিকে উড়িয়ে দেয়না, ব্যক্তিকে ব্যাখ্যা করে। আমিত্বকে বিনাশ করতে বলেনা, প্রকৃত আমিত্ব কি তাই বুঝিয়ে দেয়। আপাতপ্রতীয়মানের মধ্য থেকে বার করে সত্য স্বরূপকে।'

'আমরা আবার ভারতবর্ষে মিশনারী পাঠাই!' বলাবলি করে শ্রোতার দল। 'ভারতবর্ষই পাঠাক এখানে মিশনারী।'

ধর্ম নয়, রুটি—রুটিই ভারতবর্ষের একমাত্র প্রয়োজন। কী ধর্ম তুমি ভারতবর্ষকে শেখাতে পারো, কী তোমার স্পর্ধা, তোমরা কোথায় ছিলে, ভারতবর্ষ যখন বেদান্ত দিয়েছে, যখন দিয়েছে বৌদ্ধবাদ যা হিন্দুধর্মেরই স্বাভাবিক পরিণতি! কোথায় তোমরা ছিলে যখন হিন্দু বলেছে, শৃণ্বন্তু বিশ্বে অমৃতস্য পুত্রাঃ। সুতরাং ধর্মের কথা বোলো না, পারো তো তার কাছে রুটি নিয়ে যাও, নিয়ে যাও রুটি তৈরি করবার যন্ত্র, নিরন্নকে খাদ্য দাও, দাও তাকে খাদ্য উৎপাদন করবার বৈজ্ঞানিক উপায়। পরশাসন তাকে অজ্ঞানে-দারিদ্র্যে জর্জর করে রেখেছে, দাও তাকে সেই শেকল-ভাঙার সামর্থ্য। তাকে মহৎ হতে পবিত্র হতে দয়ালু হতে শোনাতে যাবার দরকার নেই। সে এমনিতেই মহৎ ও পবিত্র আছে, দয়ার সে নিত্যনির্ঝর। তাকে ক্ষুধা থেকে রোগ থেকে অশিক্ষা থেকে মুক্ত হবার মন্ত্র শোনাও—যদি সে মহত্ব সে পবিত্রতা সে করুণা তোমার থাকে।

'আপনি কোথায় আছেন? আমাদের বাড়িতে থাকবেন চলুন।' কত লোক সস্নেহ অনুরোধ করতে লাগল।

'আপনাকে যদি অতিথি রূপে পাই, আমরা ধন্য হই, আমাদের গৃহ ধন্য হয়।'

'শুধু ধন্য? আমাদের গৃহ পুণ্যময় হয়ে ওঠে।'

'মন্দির হয়ে ওঠে।—আপনি যাবেন?'

দেশে চিঠি লিখছেন স্বামীজিঃ 'আমেরিকানদের দয়ার কথা কী বলব। জানো, আমার আর এখন এক কপর্দক অভাব নেই। আমার বাড়ি ভাড়া বা খাইখরচার জন্যে এক পয়সাও লাগেনা। ভাবতে পারো? ইচ্ছে করলে এই শহরের যে কোনো সুন্দর বাড়িতে আমি থাকতে পারি। এ বাড়ি নয় তো ও বাড়ি, সব সময়েই কারু না কারু অতিথি হয়ে আছি। এত সুখ যেন কল্পনার অতীত ছিল। ইউরোপে যেতে যে আমার খরচ লাগবে, জানো, তাও আমি এখান থেকে পাব। ক্ষণে ক্ষণে বুঝছি প্রভু আমার সঙ্গে-সঙ্গে আছেন আর আমি তাঁর আদেশ পালন করবারই চেষ্টা করছি। জগতের লোকের ভালোবাসার বস্তু অনেক আছে—

তারা তাদের ভালো বাস্থক—আমাদের প্রেমাস্পদ শুধু একজন—আর কেউ নয়, প্রভুই আমাদের একমাত্র প্রেমাস্পদ।'

ধর্মসভার প্রতিনিধিদের বাড়িতে রাখতে আগ্রহ দেখাচ্ছে অনেকে। শুধু আগ্রহ নয়, সভার কার্যালয়ে প্রত্যক্ষ আবেদন করছে কেউ কেউ। আমি স্থান দিতে পারি একজনকে, আমি একাধিক। বেশ উদার স্বভাব দেখে কাউকে পাঠাবেন, কিংবা বড় জোর একজন খৃস্টান দেশের লোক।

মিসেস জন লিয়ন, ২৬২ মিচিগান এভিনিয়ুতে থাকে, সেও একজন চেয়ে পাঠাল। কোনো শর্ত আরোপ করে দেয়নি। ধর্মের ব্যাখ্যাতা যখন তখন নিশ্চয়ই সাধারণের বাইরে।

খবর এল, তোমার বাড়িতে পাঠাচ্ছি একজনকে।

বাড়ি তখন অতিথিতে ভর্তি, শহর-মফস্বল থেকে আত্মীয়স্বজন অনেকে এসেছে এই ধর্মসভার আকর্ষণে, কোনো ঘরই আর খালি নেই। এখন এই প্রতিনিধিকে জায়গা দিই কোথায় ? মিসেস লিয়ন ভাবনায় পড়লেন। দেরি নেই, আজ সন্ধ্যায়ই তো সে আসছে।

তোর ঘরটা খালি করে দে। বললেন বড় ছেলেকে।

কে আসছে ?

কই, নাম পাঠায়নি তো। যে আস্থক, ঘর একখানা তাকে দিতে হবে। তুই কোনো বন্ধুর বাড়িতে গিয়ে আশ্রয় নে।

কে এমন সে নবাবপুত্তুর ! ছেলে গজগজ করতে লাগল কিন্তু মায়ের কথার আবাধ্য হলনা।

আসতে-আসতে সেই মধ্যরাত্রি !

ঘণ্টা শুনে দরজা খুলে দিয়ে তো সবাই বাক্যহীন। এ কি ! স্বামী বিবেকানন্দ ! (ক্রমশঃ)

গল্প নয়!

শ্রীসৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়

১৯০০ সাল, তারিখ ২৮ জুলাই।

ইতালীর রাজা প্রথম উমবার্টো তাঁর 'এডি' জেনারেল গোঞ্জিয়ো ভগেলিয়ার সঙ্গে বেড়াতে বেরিয়ে ছিলেন। মোঞ্জা গ্রামে এক রেস্তঁরায় তিনি বসলেন তাঁর জেনারেলের সঙ্গে পানভোজন করতে।

রেস্তঁরার মালিক—তাঁর প্রৌঢ় বয়স—বেশ ভব্যিযুক্ত চেহারা—প্রকাণ্ড পাকা গোঁফ—তিনি বেশ হুঁশিয়ার হয়ে ওয়েটারদের নির্দেশ দিচ্ছেন,—তাদের কাজের উপর নজর রাখছেন।

তার উপর দৃষ্টি পড়তে রাজা বললেন জেনারেলকে—লোকটিকে কোথায় যেন দেখেছি—মুখখানা খুব চেনা-চেনা মনে হচ্ছে। ডাকো তো ওকে জিজ্ঞাসা করি।

মালিককে ডাকা হলো—মালিক এসে সেলাম করে দাঁড়ালো রাজার সামনে।

রাজা বললেন—তোমার মুখ খুব চেনা-চেনা মনে হচ্ছে। তোমাকে কোথায় দেখেছি বলো তো?

সেলাম করে মালিক বললে—যদি অপরাধ না নেন্ মহারাজ তাহলে বলবো, আপনার আয়নায় আমার মুখ দেখেছেন। সকলে আমাকে বলে, মহারাজের মুখ চোখ চেহারার সঙ্গে আমার চেহারার আশ্চর্য্য মিল আছে নাকি!

জেনারেল বললেন—কথাটা সত্য মহারাজ।

রাজা বললেন—হুঁ। ঠিক কথা—তোমার চেহারা হুবহু আমার মতো—আশ্চর্য মিল! গোঁফ আমার গোঁফের মতো—মাথায় আমার সমান লম্বা—এক রকম গড়ন—মুখচোখ একই রকম। আচ্ছা তোমার নাম কি শুনি।

মালিক বললে—আমার নাম মহারাজ উমবার্টো। ১৮৪৪ সালের ১৪ মার্চ তারিখে সকাল বেলায় আমার জন্ম।

রাজা বললেন—বাঃ, আমিও তো জন্মেছি ঐ বছরের ঐ মার্চ মাসে এবং ১৪ তারিখে সকাল বেলায়। আচ্ছা কোথায় তোমার জন্ম?

—আজ্ঞে মহারাজ, তোরিনো গ্রামে।

রাজা বললেন—আমিও জন্মেছি তোরিনো গ্রামে। তোমার বিবাহ হয়েছে?

মালিক বললেন—আজ্ঞে হ্যাঁ। আমার বিবাহ হয়েছে ১৮৬৬ সালে ২ এপ্রিল তারিখে। আমার স্ত্রীর নাম মার্গারিটা।

রাজা চমকে উঠলেন। বললেন—আমারো বিবাহ হয়েছে ১৮৬৬ সালের ২ এপ্রিল তারিখে। এবং মহারানীর নাম হলো মার্গারিটা! তোমার ছেলেমেয়ে কটি?

মালিক বললে—একটি ছেলে মহারাজ। ছেলের নাম বিতোরিয়ো।

রাজার ভ্রূ হলো কুঞ্চিত। তিনি বললেন—যুবরাজের নামও বিতোরিয়ো।···ভালো কথা, তোমার এ রেস্তঁরা কবে থেকে চালাচ্ছো?

মালিক বললে—১৮৭৮ সালের ৯ জানুয়ারি তারিখে আমি এ রেস্তঁরা খুলেছি।

রাজা বললেন—বহুৎ আচ্ছা! আমিও রাজা হয়ে সিংহাসনে বসেছি ১৮৭৮ সালের ৯ জানুয়ারি তারিখে।

মালিক বললে—অপরাধ নেবেন না মহারাজ। আরো কিছু আমার বলবার আছে।

—বলো।

মালিক বললে—আগে দু'বার মহারাজের সঙ্গে দু'টি ব্যাপারে আমার দেখা হয়েছে। ১৮৬৬ সালে এবং ১৮৭০ সালে—দু'বারই আমরা দু'জনে মাত্র সাহসিকতার জন্য পদক-ভূষণে ভূষিত হয়েছিলুম।

রাজা দেখলেন, মালিকের জামার বুকে দু'খানি পদক। তিনি বললেন—কিজন্য তুমি দু'খানি পদক পেয়েছো?

মালিক বললে—১৮৬৬ সালে আমি ছিলুম ফৌজে প্রাইভেট, ১৮৭০ সালে ছিলুম সার্জেণ্ট—মহারাজ ছিলেন ১৮৬৬ সালে কর্নেল এবং ১৮৭০ সালে কমাণ্ডার।

রাজা খুশী হয়ে বললেন—আশ্চর্য, আশ্চর্য!

রাজাকে সেলাম করে মালিক বললে—মহারাজের সেবায় এ জীবন যেন কাটে—এমন আশা আমি করতে পারি মহারাজ!

রাজা বললেন—যখনি আমি মোঞ্জায় আসবো তোমার রেস্তঁরায় আমি পানভোজন করবো। খেলাধূলা তোমার ভালো লাগে?

মালিক বললে—খুব ভালো লাগে মহারাজ। মহারাজ কাল এথলেটদের যেখানে পুরস্কার দেবেন, আমি সেখানে নিশ্চয় হাজির থাকবো।

রাজা বললেন—বেশ আমি তোমাকে সেখানে দেখতে চাই। তোমাকে আমি বিশেষ পুরস্কার দেবো। তুমি নিশ্চয় আসবে।

আসবো মহারাজ।

রেস্তঁরা থেকে রাজা বললেন তাঁর জেনারেলকে—ও আমার মিতে—ওকে আমি কাল ইতালীয় ক্রাউন কাভালিয়ার করবো। ও যেন আসে—তুমি দেখো।

পরের দিন পুরস্কার বিতরণের মাঠে বিরাট জনতা। রাজা অধীরভাবে প্রতীক্ষা করছেন কোথায় সেই রেস্তঁরার মালিক? তার দেখা নেই এখনো—সময় বহে যায়।

জেনারেল এলেন। রাজা বললেন—আমার মিতা?

নিঃশ্বাস ফেলে জেনারেল বললেন—বড় দুঃখের কথা মহারাজ। আজ সকালে বন্দুকের গুলি বুকে বিঁধে তার মৃত্যু হয়েছে। পুলিশের অনুমান সে আত্মহত্যা করেছে।

কিন্তু—

রাজা নিঃশ্বাস ফেললেন, বললেন—বড় দুঃখের কথা। কখন তার দেহ কবরে দেওয়া হবে খবর নাও—আমি নিজে সে সময় সেখানে উপস্থিত থাকবো—তার সম্মানে।

রাজার কথা শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গে হঠাৎ পিস্তলের দুটি শব্দ···গুড়ুম গুড়ুম। দু'টি গুলি লাগলো রাজার বুকে—তিনি চিরনিদ্রায় অভিভূত হলেন—তাঁর দেহ হলো ভূলুণ্ঠিত।

পিণ্টুবাবু

শ্রীবিভা সরকার

ছোট্ট ছেলে পিণ্টুবাবু
পিপঁড়ে দেখে বেজায় কাবু
ইঁদুর ছেনা আতঙ্ক তাঁর
লেজটি পাছে নাকে ঢোকায়।
বেড়াল ঠেঙান কুকুর তাড়েন
বাঘ ভাল্লুক থোড়াই মানেন
আরস্যুল্লা তেলাপোকায়
গবেষণার খোরাক যোগায়?

বাগমানানো যায় না তাঁকে
ঠেঙান ধরে একে-তাকে
আস্ত কিছু নেইকো ঘরে
ওলটপালট ভূশুণ্ডি মাঠ।
টেবিল চেয়ার উল্টে ফেলেন
ঘরেই গুলি ডাণ্ডা খেলেন
ভাঙল বুঝি আরশি ছবি
লেগেই আছে হল্লার হাট।

(১)

এক যে আছে ঘোড়া,
ভাতের পাতে ওড়ায় সে রোজ
দশটি বেগুন পোড়া।
পাক্কা রানার, ভীষণ গোঁয়ার
আরব দেশের ঘোড়া॥

(২)

এক যে আছে উট,
চায়ের সাথে শেষ করে সে
তিনঠোঙ্গা ডালমুট।
ক্যাবলা মুখো, পাটকিলে রং
ঠাণ্ডা মাথা উট॥

(৩)

এক যে আছে জিরাফ,
রোজ দুপুরে খায় সে ক'ষে
বোতল বোতল সিরাপ।
জংলীদাদা, লম্বা গলা
আস্ত বোবা জিরাফ॥

টেস্ট ম্যাচে সেরা বোলার

বিনয় মুখোপাধ্যায়

দশ বছর পরে ওয়েস্ট ইণ্ডিজ ক্রিকেট দল আবার ভারতবর্ষে খেলতে এসেছে। সেনাদল, বিশ্ববিদ্যালয় ও বিভিন্ন অঞ্চলের বিরুদ্ধে অনেকগুলি খেলা হয়েছে। তা'ছাড়া ভারতীয় দলের সঙ্গে তারা চারটে টেস্ট ম্যাচও খেলেছে। এই লেখাটা ছাপা হওয়ার আগেই বোধ হয় পঞ্চম অর্থাৎ সর্বশেষ টেস্ট খেলাটাও দিল্লীতে শেষ হবে।

চারটে টেস্টের একটাতেও ভারতীয় দল জিততে পারেনি। বম্বের ব্র্যাবোর্ণ স্টেডিয়ামে প্রথম টেস্টে তবুও যাহোক তারা ড্র করেছিল। কানপুর, কলকাতা ও মাদ্রাজের টেস্টগুলিতে তাদের হারের একশেষ হয়েছে।

খেলায় হেরে গেলে কার না দুঃখ হয়? বিশেষতঃ আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতায়—যেখানে খেলা হয় দুটো দেশের মধ্যে, সেখানে হার হলে দেশের প্রতিটি মানুষের মনেই আঘাত লাগে। কারণ সেখানে হার-জিতের সঙ্গে জড়িত থাকে দেশের সুনাম ও সম্মান।

কিন্তু পরাজয়েরও রকম ফের আছে। প্রতিপক্ষের সঙ্গে সমানে পাল্লা দিয়ে হেরে গেলে মন খারাপ হলেও মাথা হেঁট হয় না। কারণ যদিও প্রতিযোগিতায় জেতাটা গৌরবের বিষয়, সাহস ও কৌশলের সঙ্গে যুঝতে পারাটাও কম কথা নয়। দুঃখের বিষয়, কানপুর, কলকাতা ও মাদ্রাজে ভারতীয় দল শুধু যে খেলায় জেতেনি তা নয়, কিছুমাত্র দৃঢ়তা বা দক্ষতারও পরিচয় দেয়নি। সেইটেই সবচেয়ে পরিতাপের বিষয়। তাই তাদের পরাভব কেবল দুঃখের নয় লজ্জারও কারণ।

ভারতীয় দলের এই শোচনীয় ব্যর্থতার মধ্যে শুধু একটি মাত্র কৃতিত্বের চিহ্ন আছে। সেটা কানপুরে সুভাষ গুপ্তের বোলিং। প্রথম ইনিংসে গুপ্তে একাই ওয়েস্ট ইণ্ডিজ দলের ন'জন ব্যাটসম্যানকে আউট করেন। টেস্ট ম্যাচে এক ইনিংসে ন'টি উইকেট পাওয়ার গৌরব একজন ভারতীয় বোলারের পক্ষে এই প্রথম। এর আগে টেস্ট ম্যাচে যে ভারতীয় বোলার সবচেয়ে বেশী

উইকেট পেয়েছেন তাঁর নাম মানকাদ। আট বছরে আগে মাদ্রাজে ভারতীয় দল ইংলণ্ড দলকে এক ইনিংসে ও আট রাণে হারিয়ে দেয়। এন. ডি. হাওয়ার্ড ছিলেন ইংলণ্ড দলের ক্যাপ্টেন। ভারতীয় দলের অধিনায়ক বিজয় হাজারে। সে খেলায় মানকাদ প্রথম ইনিংসে একাই ইংলণ্ড দলের আটজনকে আউট করেন। পরের বছর পাকিস্তান ক্রিকেট দল খেলতে আসে ভারতে। দিল্লীতে যে প্রথম টেস্ট ম্যাচ হয়, সে খেলায়ও মানকাদ আটটি উইকেট নিয়েছিলেন। এবার গুপ্তে মানকাদের রেকর্ডকে ছাড়িয়ে গেলেন।

শুধু ভারতীয় নয়, যে-কোনো দেশের বোলারদের মধ্যেই গুপ্তের এই কৃতিত্ব খুব অসাধারণ। আর একটি মাত্র উইকেট পেলেই গুপ্তে ইংলণ্ডের স্পিন বোলার জিম লেকারের সমান হতেন। লেকার ১৯৫৬ সালে মাঞ্চেস্টারে অস্ট্রেলিয়ার সঙ্গে টেস্ট খেলায় এক ইনিংসে দশটি উইকেট নিয়েছেন। টেস্ট ম্যাচে বোলিং-এর ইতিহাসে সেই হলো বিশ্ব-রেকর্ড। সে-রেকর্ড কেউ কোনো দিন ভাঙতে পারবে না। এক ইনিংসে দশজনের বেশী তো আর আউট করা যায় না।

লেকারের রেকর্ড আরও একটি কারণে সবার উপরে। তিনি যে শুধু এক ইনিংসে দশটি উইকেট পেয়েছেন তা নয়, ঐ ম্যাচেরই প্রথম ইনিংসে তিনি ন'টি উইকেট নিয়েছেন। টেস্ট ম্যাচের দুই ইনিংসে কুড়িজনের মধ্যে ১৯ জনকে আউট করেছে একই বোলার—এমন ঘটনা এর আগে কোনো দিন ঘটেনি। ঘটা দূরে থাক কেউ কখনও ভাবেওনি।

বিশ্ব-রেকর্ডের নীচে হলেও টেস্টে এক ইনিংসে ন'টি উইকেট নেওয়া খুব সহজ কথা নয়। পৃথিবীতে টেস্ট খেলার গোড়াপত্তন হয়েছে ১৮৭৬ সালে। সে-বছর মার্চ মাসে ইংলণ্ড ও অস্ট্রেলিয়ার মধ্যে যে খেলা হয়, সেই হলো প্রথম টেস্ট ম্যাচ। তার পরে গত ৮৩ বছর ধরে ইংলণ্ড, অস্ট্রেলিয়া, ভারতবর্ষ, দক্ষিণ আফ্রিকা, ওয়েস্ট ইণ্ডিজ, নিউজিল্যাণ্ড ও পাকিস্তান—এই সাতটি দেশের মধ্যে আজ পর্যন্ত চার শ'র উপরে টেস্ট খেলা হয়েছে। টেস্ট ম্যাচের এই সুদীর্ঘ ইতিহাসে একই বোলার এক ইনিংসে ন'টি উইকেট নিয়েছে—এমন ঘটনা ঘটেছে মাত্র সাতবার।

প্রথম যে বোলার টেস্টে এক ইনিংসে ন'টি উইকেটের রেকর্ড সৃষ্টি করেন, তাঁর নাম জর্জ লোম্যান। লোম্যান টেস্ট খেলতে সুরু করেন একুশ বছর বয়সে, অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে। প্রথম টেস্টেই তিনি প্রথম ইনিংসে সাতটি ও দ্বিতীয় ইনিংসে পাঁচটি উইকেট নেন। ১৮৯৫ সালে যে ইংলণ্ড দল সাউথ আফ্রিকায় খেলতে যায়, লোম্যান ছিলেন তার ম্যানেজার। লর্ড হক ছিলেন দলের ক্যাপ্টেন। তিনি ম্যানেজারকে বোলার হিসাবে ব্যবহার করতে ছাড়লেন না। লোম্যান সেই সফরে ১৫৭টি উইকেট নিলেন গড়পড়তা মাত্র ছ'রানের বদলে। জোহেনসবার্গের টেস্টে প্রথম ইনিংসে ন'টি উইকেট নিলেন ১৪.২ ওভার বল দিয়ে। তার মধ্যে আবার ছ'টাই মেডেন। রান

দিয়েছিলেন কত ? মাত্র ২৮। অর্থাৎ মাত্র তিন রানের বদলে লোম্যান প্রতিটি উইকেট পেয়েছেন। পনর দিন আগে পেটি এলিজাবেথে যে টেস্ট খেলা হয়, তাতেও লোম্যানের কৃতিত্ব কম ছিল না। প্রথম ইনিংসে সাতটি উইকেট নিলেন। দ্বিতীয় ইনিংসে তাঁর বোলিং হলো আরও মারাত্মক। ন' ওভার বল দিয়ে সাত রানের বদলে নিলেন আটটি উইকেট। তার মধ্যে ছ'টিই একেবারে সোজা স্টাম্প উপড়ে।

লোম্যানের মতো এত কম রানে এত বেশী উইকেট নেওয়ার কৃতিত্ব খুব কম বোলারেই দেখাতে পেরেছে। কিন্তু এমন চৌকশ বোলারও বেশী দিন টেস্ট খেলতে পারেনি। প্রথমতঃ তাঁর স্বাস্থ্য ছিল খুব খারাপ। অসুখের জন্য মাঝে মাঝে টেস্টের জন্য নির্বাচিত হয়েও তিনি মাঠে নামতে পারে নি। তাছাড়া ক্রিকেট কর্তৃপক্ষের সঙ্গে মন কষাকষিও কম ছিল না।

যে-বছরে লোম্যান টেস্ট বোলিং-এ রেকর্ড সৃষ্টি করলেন ঠিক তার পর বৎসর অস্ট্রেলিয়া ইংলণ্ডে খেলতে এসেছিল। ওভালের টেস্টে লোম্যান টিমে নির্বাচিত হলেন। কিন্তু তিনি ও আর চারজন খেলোয়াড় কর্মকর্তাদের চিঠি লিখে জানালেন, খেলার জন্য যে ফি দেওয়া হয় তা বাড়িয়ে না দিলে তাঁরা টেস্ট খেলবেন না। সে-সময়ে প্রতি টেস্টে পেশাদার খেলোয়াড়কে দশ পাউণ্ড অর্থাৎ এখনকার হিসাবে প্রায় ১৩৩ টাকার মতো ফি দেওয়া হতো। লোম্যান চাইলেন কুড়ি পাউণ্ড। ডব্লিউ জি. গ্রেস ইংলণ্ড দলের ক্যাপ্টেন। খুব কড়া লোক। তিনি চটে আগুন। বললেন, "কী, ভয় দেখিয়ে টাকা আদায় ? কিছুতেই নয়।" খেলার আগের দিন তিনজন খেলোয়াড় তাঁদের চিঠি ফিরিয়ে নিলেন। শুধু লোম্যান ও গান্ তাদের দাবীতে অটল হয়ে রইলেন। ফলে এ-দুজনকে টেস্ট টিম থেকে বাদ দেওয়া হলো। তার চার বছর পরেই যক্ষা রোগে লোম্যানের মৃত্যু ঘটে।

লোম্যানের মৃত্যুর বারো বছর পরে টেস্ট ম্যাচে এক ইনিংসে ন'টি উইকেটের রেকর্ড ধরে ফেললেন এস. এফ. বার্নস। দক্ষিণ আফ্রিকায় ঐ জোহেনসবার্গের মাঠেই। লোম্যানের মতো বার্নস ছিলেন ইংলণ্ড দলের বোলার। লোম্যানের মতো তিনিও বল দিতেন সাধারণতঃ মিডিয়ম ফাস্ট।

বোলিং-এ বার্নসের নাম বিলেতে প্রায় চলতি প্রবাদের মতো। ক্রিকেট মহলে আজও তার বোলিং-এর নানা গল্প শোনা যায়। সাউথ আফ্রিকায় তো ক্রিকেট পণ্ডিতেরা এখনও কোনো নতুন বোলারের গুণ বিচার করতে বসে প্রশ্ন করেন—"ভালো বোলার ? কতখানি ভালো ? বার্নসের কাছাকাছি ?"

ইংরেজী ১৯১৩ সালের ডিসেম্বর মাস। জার্মানীর সম্রাট কাইজার উইলহেলম যে ছ'মাসের মধ্যেই পৃথিবীতে প্রথম মহাযুদ্ধের আগুন জ্বালাবেন সে-কথা কেউ ভাবতেও পারেনি। জোহেনস-বার্গের মাঠে হাজার হাজার লোক জড়ো হয়েছে ইংলণ্ড ও সাউথ আফ্রিকার টেস্ট ম্যাচ দেখতে।

প্রথম ইনিংসে সাউথ আফ্রিকা রান তুলল ১৬০। বার্নস একাই সাউথ আফ্রিকার আট জন ব্যাটসম্যানকে আউট করলেন মাত্র ৫৬ রানের বদলে।

ইংলণ্ড দলের রান সংখ্যা হলো ৪০৩। দ্বিতীয় ইনিংসে সাউথ আফ্রিকার পক্ষে ইনিংস পরাজয় এড়াতে চাই ২৪৩ রান। ম্যাচ জেতার কথা হবে তার পরে। সে ইনিংসে বার্নসের বলে সবচেয়ে আগে আউট হলেন সাউথ এফ্রিকার ক্যাপ্টেন টেইলার নিজে। তার পর একে একে ব্যটসম্যানেরা মুখ কালো করে ফিরে যেতে লাগলেন প্যাভিলিয়নে। একমাত্র বোমণ্ট ছাড়া আর সবাই আউট হলেন বার্নসের বলে। কেউ কট কেউ, স্টাম্পড, কেউবা সোজা বোল্ড। এ যুগের সাউথ আফ্রিকার ক্যাপ্টেন ডাডলী নুরসের বাবা ডাভে নুরস ছিলেন সে সময়কার একজন নামজাদা খেলোয়াড়, ইংরেজীতে যাকে বলে স্টার ব্যাটসম্যান। ৫৬ রানের মাথায় বার্নসের বলে তিনি উইকেট কীপারের হাতে কট আউট হলেন। ইনিংস পরাজয় ঘটল সাউথ আফ্রিকার। টেস্ট ম্যাচে দুই ইনিংসে ১৭টি উইকেট নিয়েছে এক বোলার এমন দৃষ্টান্ত বহুকালের জন্য ক্রিকেটের ইতিহাসে অদ্বিতীয় হয়ে রইল।

বার্নসের পরে টেস্টে এক ইনিংসে ন' উইকেটের গৌরবলাভ করলেন একজন অস্ট্রেলিয়ার বোলার। নাম,—আর্থার মেইলী।

মেইলীকে এ যুগের তরুণেরা বেশীরভাগই জানে একজন ক্রিকেট-লেখক হিসাবে। তাঁর লেখা ক্রিকেটের বই বা প্রবন্ধ এদেশেও অনেকেই পড়ে থাকবেন। তাঁরা শুনে হয়তো অবাক হবেন যে, এই লেখার জন্যই মেইলীকে অকালে ক্রিকেট খেলা ছাড়তে হয়েছে। মেইলী একবার খবরের কাগজে অস্ট্রেলিয়ার ক্রিকেট কর্তৃপক্ষ সম্পর্কে কয়েকটা কড়া কথা লিখেছিলেন। কর্তারা চটে গেলেন। তাঁরা মেইলীকে ক্রিকেট থেকে 'একঘরে' করে শাস্তি দিলেন।

টেস্টম্যাচে মেইলীকে প্রথম দেখা যায় ১৯২০ সালের শেষের দিকে। সাউথ আফ্রিকায় বার্নসের সেই বিশ্ব রেকর্ডের ছ' বছর পরে। অবশ্য এক হিসাবে সেটা সাউথ আফ্রিকার ঠিক পরবর্তী টেস্ট। কারণ প্রথম মহাযুদ্ধের জন্য ঐ ছ'বছর আন্তর্জাতিক ক্রিকেট খেলা একেবারেই বন্ধ ছিল। মেইলী তাঁর প্রথম টেস্ট খেলার বছরেই বার্নসের রেকর্ড ধরে ফেললেন। সে বছর ইংলণ্ড অস্ট্রেলিয়ায় খেলতে এসেছে। চতুর্থ টেস্ট শুরু হলো মেলবোর্ণে। প্রথম ইনিংসে মেইলী নিলেন চার উইকেট। দ্বিতীয় ইনিংসে তাঁর বলের মুখে ইংলণ্ডের কোনো ব্যাটসম্যানই দাঁড়াতে পারলেন না। মাত্র ১৩ রান তুলেই হবস্ হলেন এল. বি। ম্যাকপীসেরও সেই দশা। তাঁরা মেইলীর গুগলীকে ঠিক চিনতেই পারেননি। ক্যাপ্টেন ডগলসকে মেইলী লেগব্রেক দিয়ে টেনে আনলেন পপিং ক্রীজের বাইরে। ফল,—স্টাম্পড। ঠিক একই কৌশলে ফ্রাঙ্ক উলীকে ফিরিয়ে দিলেন প্যাভিলিয়নে। তাঁর রান সংখ্যা শূন্য। রোডস এবং পি. জি. এইচ. ফেণ্ডার দু'জনেই কট আউট।

প্যাটসি হেনড্রেনও ব্যাটের কিনারায় ছুঁয়ে ক্যাচ তুললেন মিড অনের হাতে। হায়, মেইলীর দুর্ভাগ্য, ফিল্ডার সে ক্যাচটা ফেলে দিল মাটিতে। হেনড্রেন বাদ পড়লেন মেইলীর নিধন তালিকা থেকে। তা নইলে লেকারের ৩৫ বছর আগেই টেস্ট ম্যাচে এক ইনিংসে দশটি উইকেট নেওয়ার রেকর্ড সৃষ্টি হতো আর্থার মেইলীর হাতে।

এইখানে একটা মজার খবর দিচ্ছি। মেলবার্ণে যে মাঠে মেইলী এক ইনিংসে ন'টি উইকেট নিলেন, ঠিক সে মাঠেই মাত্র এক মাস আগে ইংলণ্ড-অস্ট্রেলিয়ার দ্বিতীয় টেস্ট খেলা হয়েছে। মেইলী অস্ট্রেলিয়ার টিমে ছিলেন। সে খেলায় দু'ইনিংসে অস্ট্রেলিয়ান দল মোট ১৫৪ ওভার বল দিয়েছে। অথচ মেইলী বল দেননি একটিও। 'দেননি' না বলে 'দিতে পাননি' বলাই ঠিক। অস্ট্রেলিয়ার ক্যাপ্টেন ছিলেন আর্মস্ট্রং। তিনি ইংলণ্ড দলকে আউট করার চেষ্টায় একে একে সাতজন বোলারকে বল দিতে দিয়েছেন। এমন কি ওপেনিং ব্যাটসম্যান কলিন্স ও পেলিউ—যাঁরা ক্লাবের ম্যাচেও কোন দিন বল দেন না—তাঁরাও দু'তিন ওভার বল দিয়েছেন। বাদ শুধু মেইলী! এ যেন আমাদের দেশে টেস্ট খেলায় গুপ্তে ও গোলাম আমেদকে মাঠে দাঁড় করিয়ে রেখে পঙ্কজ রায় ও নরী কণ্ট্রাক্টরকে দিয়ে বল দেওয়ানো!

(ক্রমশঃ)

কৃতজ্ঞতা

শ্রীদুর্গাদাস মুখোপাধ্যায়

মশা কয়, "শুন ওহে! মশারি মশাই
ছেড়ে দাও প্রাণ ভ'রে নর-রক্ত খাই।
বন্ধু তুমি, ভাই তুমি, হৃদি তুমি মোর
অনাহারে মরি যদি, প্রাণে সবে তোর?"

ঈষৎ হাসিয়া তারে কহিল মশারি
"বন্ধু-ভাই বল যারে, সে যে তব অরি!
মানুষের দাস আমি—জেনো মহাশয়;
পীড়ন করিবে তারে, সে কি সহ্য হয়?"

বুড়ীর বাজার

গোপাল ভৌমিক

(আফ্রিকার রূপকথা)

একবার হয়েছিল কি, কোয়াকু আনান্‌সির গ্রামে দারুণ অজন্মা দেখা দিয়েছিল। কারও ঘরেই সে বছর খাবার ছিল না। প্রতিদিন কোয়াকু আর তার ছেলে টিকুমা বনে যেত খাবার সংগ্রহের আশায়। একদিন খাবার খুঁজতে খুঁজতে টিকুমা বনের এমন একটা অঞ্চলে গিয়ে হাজির হলো যেখানে সে আগে কখনও যায় নি। কয়েক মাইল এক সঙ্গে হেঁটেও সে কিন্তু কোন খাদ্যবস্তু পেল না। হাঁটতে হাঁটতে হঠাৎ সে বনের মধ্যে একটা খোলা জায়গায় এসে পড়ল এবং দেখল যে সেখানে বাজারের মত অনেকগুলি ছোট ছোট দোকান ঘর আছে।

টিকুমা ভাবল : "এ তো মজার ব্যাপার দেখি। আশেপাশে যখন কোন গ্রাম নাই তখন এখানে তো কোন বাজার বসতে পারে না।"

পর মুহূর্তে টিকুমা দেখতে পেল যে, একটা বিরাট ঝাঁটা নেমে এল আকাশ থেকে এবং প্রত্যেক দোকানের ভিতর দিয়ে সেটি আপনা-আপনি ঝাঁট দিয়ে ধুলো ময়লা সাফ করতে লাগল।

টিকুমা মনে মনে ভাবল : "আমি তো দেখছি নিজের চোখকেও বিশ্বাস করতে পারি না। জনশূন্য বাজার আর নিজে-নিজে ঝাঁট-দেওয়া ঝাঁটা!"

এর পরে যা ঘটল তা আরও বেশি বিস্ময়কর। আকাশ থেকে ধীরে নেমে এল একটা বড় তেপায়া টুল আর তার পিছনে পিছনে নেমে এল এক বিরাটকায় বুড়ী।

বুড়ী এসে সেই টুলের উপর বসেই দুটি হাত দিল তার গালে এবং সুতীক্ষ্ণ গলায় চীৎকার করে উঠল : "তোমরা সবাই বেরিয়ে এস।" বুড়ীর গলার স্বর এত তীক্ষ্ণ যে সে-স্বর শুনে টিকুমার দাঁতে দাঁত লেগে যাবার অবস্থা।

বুড়ীর ডাক শুনেই সেখানে অনেক লোক এসে হাজির হল, আর তারা সবাই বয়ে আনল

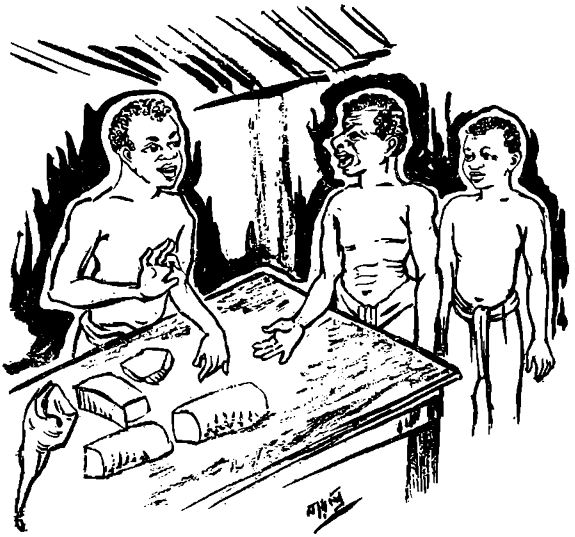

দোকানে রুটি বিক্রি হচ্ছে

খাবার ভর্তি ঝুড়ি। প্রত্যেকে এক-একটি দোকান দখল করে নিজেদের মালপত্র বিছিয়ে বসল। টিকুমা মনে মনে বলল: "কিন্তু খদ্দের কোথায়?"

সে ধৈর্য ধরে অনেকক্ষণ অপেক্ষা করেও কোন খদ্দের দেখতে পেল না।

অবশেষে টিকুমা আপন মনেই বলল: "বেশ, কেউ যদি এই সব চমৎকার খাবার না কেনে, তা হলে আমিই কেনার চেষ্টা করে দেখি।" কাজেই সে সাহসে ভর করে বাজারে ঢুকল এবং সুন্দর একটি রুটির দোকানে গেল। টিকুমা দোকানীকে নমস্কার জানিয়ে বলল: "আপনার রুটির দাম কি আমি জিজ্ঞাসা করতে পারি?"

দোকানী বলল: "নিশ্চয়ই। একটি রুটি নিলে আপনার কিছু লাগবে না। আর যদি পাঁচটা করে এক সঙ্গে কেনেন তা হলেও কোন দাম লাগবে না। দশটা কিনলে আরও দাম কমবে—এ জন্যও আপনাকে কিছু দিতে হবে না। দোকানের পিছনে রাখা বড় রুটিগুলির দাম একটু বেশি—বিনামূল্যে তিনটি করে।"

টিকুমা বলল: "কিন্তু এতো দেখছি অসম্ভব ব্যাপার!"

যে মেয়েটি রুটি বিক্রি করছিল সে বলল: "অবশ্য আপনার কাছে যদি দাম বেশি বলে মনে হয়, আপনি কিনবেন না।"

টিকুমা তাড়াতাড়ি বলল: "আমি বরং উল্টো কথা ভাবছি—দামটা বড় বেশি সস্তা। আমি দু'ডজন নেব।"

মেয়েটি দু'ডজন রুটি গুণে টুকিমাকে দিল, আর সে সেগুলি নিজের থলেতে ভরে পরের দোকানটায় গেল। পরের দোকানটায় ছিল অনেক রকমের টাট্‌কা মাংস।

এখানেও টিকুমা দোকানীকে বলল: "দয়া করে আমাকে মাংসের দামটা জানাবেন কি?"

উত্তর এল : "দাম গতকালের মতই ঠিক আছে। গরুর মাংস বিনামূল্যে এক পাউণ্ড, ভেড়ার বাচ্চার চপ বিনা পয়সায় চারটি। অবশ্য দুটোর বেশি একসঙ্গে কিনলে আরও কম হবে দাম।"

টিকুমা বলল : "আমি বারো পাউণ্ড গরুর মাংস নেব।"

দোকানী এক টুকরো খড়ি নিয়ে তাড়াতাড়ি হিসাব করে বলল : "এর জন্যে আপনাকে কিছুই দিতে হবে না।"

কাজেই টিকুমা বারো পাউণ্ড গরুর মাংস থলেতে ভর্তি করে পরের দোকানে গিয়ে হাজির হলো। সে দোকানে সে বিনামূল্যে ১০টা হিসেবে ২৫টি ফল কিনল। তাকে কিছুটা দরদস্তুর করতে হল এখানে, কেন না দোকানী প্রথমটায় বিনামূল্যে ১২টা করে ফল ফল বিক্রি করতে চাইল।

অল্প সময়ের মধ্যে বিনামূল্যে কেনা খাবার-দাবারে টিকুমার থলে গেল বোঝাই হয়ে। কাজেই সে বাড়ির দিকে রওনা হল। কিন্তু সে ফাঁকা জায়গাটার প্রান্তে যেতে না যেতে বুড়ীর সেই তীক্ষ্ণ চীৎকার শুনতে পেল : "তোমরা সবাই ভিতরে চলে এসো।" সঙ্গে সঙ্গে তাদের জিনিসপত্র তুলে নিয়ে দোকানীরা অদৃশ্য হল। বুড়ী তখন উপরে আকাশে উঠতে লাগল—পিছনে পিছনে উঠল তার টুল ও ঝাঁটাটা।

টিকুমা তাদের গ্রামে ফিরে এলে সবাই তার আনা খাবার দেখে বিস্মিত হয়ে গেল—তারা আরও বিস্মিত হল যখন শুনল যে, এত খাবারের জন্যে টিকুমাকে একটা পয়সাও দিতে হয় নি।

কোয়াকু ছেলেকে বলল : "আগামী কাল তুমি আমাকে বুড়ীর বাজারে নিয়ে যাবে - আমি কিছু কেনাকাটা করব।"

টিকুমা বলল : "আমি তোমাকে নিয়ে যাবো—তবে তুমি অতি লোভ করবে না—এই প্রতিশ্রুতি আমাকে দিতে হবে।"

পরদিন সকালে কোয়াকু ও টিকুমা দু'জনে জঙ্গলের পথে রওনা হল। অনেক ঘণ্টা ধরে হেঁটে হেঁটে তারা যে ফাঁকা জায়গাটায় দোকান ঘরগুলি ছিল সেখানে এসে হাজির হল।

দোকান ঘরগুলি দেখেই কোয়াকু বলে উঠল : "কি সুন্দর কাঠ দিয়ে এগুলি তৈরী! আমি বাড়ি ফেরার সময় আমার নতুন গোলা বাড়িটার ছাদে লাগাবার জন্যে এখান থেকে কিছু কাঠ নিয়ে যাব।"

এই কথা বলে কোয়াকু বাজারের মধ্যে দৌড়ে গেল এবং একটা দোকানকে টেনে-হিঁচড়ে ভেঙে ফেলল। কাঠের তক্তাগুলি সে ঝোপের মধ্যে টেনে এনে একটা গাছের তলায় রাখল।

এরপর আগের দিনের মতই সেই ঝাঁটাটা নেমে এল আকাশ থেকে এবং দোকান ঘরগুলি পরিষ্কার করার কাজে লেগে গেল। কোয়াকু চীৎকার করে বলল : "আমি জীবনে যত ঝাঁটা

দেখেছি এটা তো তার মধ্যে সব চেয়ে ভাল। বাড়ি ফেরার সময় আমি বৌ-এর জন্যে এটাও নিয়ে যাবো। সে আবার বাজারে দৌড়ে গিয়ে ঝাঁটাটিকে নিয়ে এলো।

এইবার বুড়ীর তেপায়া টুলটা ধীরে ধীরে আকাশ থেকে এল নেমে। কোয়াকু চীৎকার চীৎকার করে ছেলেকে বলল: "বাছা, জীবনে এত বড় টুল কখনও দেখেছো? আমি এটা বাড়ি নিয়ে গিয়ে টেবিল হিসাবে ব্যবহার করব।"

এবার আকাশ থেকে নেমে এল বুড়ী নিজে এবং টুল না থাকায় মাটির উপর বসে চীৎকার করে উঠল: "তোমরা সবাই বেরিয়ে এসো।" তৎক্ষণাৎ মালপত্র নিয়ে বেরিয়ে এলো সব দোকানী।

কোয়াকু সঙ্গে সঙ্গে বাজারে গিয়ে প্রথম দোকানটায় ঢুকে পড়ল। কিন্তু সে দেখল যে, ডিমের মত ছোট ছোট পোকায় খাওয়া অল্প কয়েকটা রুটি পড়ে আছে।

সে দোকানীকে বলল: "আজ দেখছি তোমার রুটিগুলি ভাল নয়। তবু এগুলি আমি নিতে পারি।"

দোকানী বলল: "এগুলি ছোট বটে, তবে খুব সস্তা। এই ধর, তোমার হাতের রুটিটার দাম—১৪ পাউণ্ড, ১০ শিলিং ৯ পেন্স!"

কোয়াকু চীৎকার করে উঠল: "কি বললে! কাল তো সব বিনামূল্যে বিক্রি করেছিলে।"

দোকানী বলল: "কাল বাজার তত খারাপ ছিল না। এখন আমাদের আবার নতুন ঝাঁটা কেনার জন্যে পয়সা বাঁচাতে হবে। যে সব ঝাঁটা নিজে নিজে ঝাড় দেয় সেগুলোর দাম খুব বেশি।"

কাজেই কোয়াকু গেল পরের দোকাটিতে। সেখানে সে দেখতে পেল বাসি ও ছোট দু'টুকরো মাংস।

কোয়াকু দেকানীকে বলল: "তোমার মাংস তো দেখছি খারাপ। এই জন্যেই তুমি বিনা-পয়সায় মাংস বেচো।

দোকানী বিস্মিত হয়ে বলল:"কে বলল তোমাকে? এক আউন্স মাংসের দাম ২৫ পাউণ্ড ১৭ শিলিং ৬ পেন্স।"

হঠাৎ বুড়ি চীৎকার করে উঠল: "তোমরা সবাই ভিতরে চলে এসো।" সঙ্গে সঙ্গে দোকানীরা সব গুছিয়ে অদৃশ্য হয়ে গেল। এবার কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে দোকানগুলিও অদৃশ্য হয়ে গেল। কয়েক সেকেণ্ডের মধ্যে বাজারের আর কিছুই বাকি রইল না পড়ে থাকতে। তারপর বুড়ীও আকাশে উঠে গেল।

তারপর বুড়ীকে আর আফ্রিকায় দেখা যায়নি। লোকে বলে সে এখন ব্যবসা করতে প্রতিদিন ইউরোপে যায়। অনেকের ধারণা সেই জন্যেই শ্বেতকায় মানুষরা এত ধনী হয়েছে এবং সুন্দর সুন্দর বাড়িতে থাকতে পাচ্ছে।

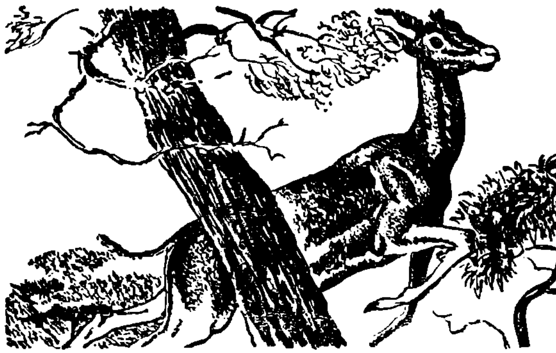

কস্তুরী মৃগ

[উপন্যাস]

দেবাচার্য

(পূর্ব-প্রকাশিতের পর)

রাগ হ'বারই কথা। সত্যি পিনাকীর অন্যায়। সেই রাত্রে ঠাকুরমার কোলের উপর মাথা রেখে গল্প শুনছিল অভ্যাসবশতঃ; কিন্তু মন ছিল অনেক দূরে। কি আশ্চর্য! বেলার কথা, শুধু বেলার কথা কেন, কারুর কথাই তো মনে থাকে না পিনাকীর। এমন কি মায়ের অসুখ—তাও ভুলে যায় পিনাকী মাঝে মাঝে। ভোলানাথ, পিনাকীর আর এক নাম ভোলানাথ। নদীর ধার দিয়ে একলা চলেছে, বোসেদের পুরোনো বাগানের কাছাকাছি আসতেই নজরে পড়ে লাল কাঠাল গাছটার ডালের দিকে। সড়াক ক'রে উঠে গেল একটা কাঠবেড়ালী। পাল বেয়ে চলেছে হাজার-মনী নৌকা নদীর কূল ঘেঁষে। গুণ টেনে চলেছে, বাঁশের চোঙা কাঁধে, বিদেশী নাবিক, বিদেশী নৌকা—দিনুমামা বলে—বন্দরে ঐ দাঁড়িয়ে জাহাজ, বেরিয়ে পড়ো বন্ধুদল। কোথায়, কোন্ বিদেশে উড়ে চলে পিনাকীর মন? কোলকাতার প্রিনসেপ্ ঘাটে অনেকগুলো জাহাজ দেখেছিল একদিন। দাদুর সঙ্গে ঘোড়ার গাড়ীতে বেড়াতে বেরিয়েছিল, গড়ের মাঠ ঘুরে চলেছে গাড়ী। বিরাট রহস্য বোঝাই জাহাজ দাঁড়িয়ে আছে—একে একে সজীব হ'য়ে ওঠে সব স্মৃতি। গল্পের বইতে পড়া, চোখে দেখা, কল্পনায় গড়া সৃষ্টির বিপুল সমারোহ। আলিপুরের চিড়িয়াখানায় কত জানা-অজানা জীবজন্তু। কলকাতার রাস্তায় কত কত জাতের, কত বিচিত্র পোশাকের, কত বিভিন্ন বর্ণের লোক। কলকাতার চেয়েও বড় শহর লণ্ডন, নিউ ইয়র্ক। ফরাসী দেশের রাজধানী প্যারিস সৌন্দর্যের খনি—অদ্ভুত বরফের দেশ ল্যাপল্যাণ্ড, গ্রীণল্যাণ্ড, আর্টিক ওশান, এণ্টার্টিক—চিরতুষারাবৃত ভূখণ্ড—পৃথিবীর শেষ—অস্ট্রেলিয়া, আফ্রিকা, আমেরিকা·· না ব্রেজিলেই যাবে সে।

ব্রেজিল, ব্রেজিল, যে ব্রেজিলের যুদ্ধে সাফল্য অর্জন ক'রে বাঙ্গালীর ছেলে সুরেশ. বিশ্বাস কর্ণেল হলেন···সেই স্বাধীন দেশেই সে যেতে চায়। ভেলায় ভাসতে ভাসতে ভারত মহাসাগর পার হয়ে গেল!—দূর, বাজে গল্প লিখেছে, ছেলেভুলোনো গল্প—পিনাকী আর ছেলেমানুষ নয় এখন। সহজ পথই তো আছে। খালাসী হয়ে কাজ নেবে একটা—কোন জাহাজে—তারপর আর কি —সমস্ত পৃথিবীটাই ঘুরে দেখবে সে। অন্ততঃ একবারের জন্য তো বটেই। মাত্র পৃথিবীতেই কি আশা মিটবে তার? পৃথিবী ছেড়ে চন্দ্রলোক, তারকার রাজ্য, সেগুলো কি হবে? না, না, জীবিত অবস্থায় তো ওখানে যাওয়া সম্ভব নয়। জীবিত অবস্থায় পৃথিবী, জীবনশেষে তারকার রাজ্য, অর্থাৎ স্বর্গ। স্বর্গের পর স্বর্গ—কত যে সৃষ্টি করেছে ব্রহ্মা! ব্রহ্মা!—বাবা বলেন, ব্রহ্মার চেয়ে বড় আর কেউ নেই।···

নীল আকাশের মাঝখান দিয়ে ভেসে চলেছে মেঘ। মেঘের উপর সূর্যের কিরণ। মনে হয় আগুন লেগেছে আকাশে। আগুনের রঙ্ কি লাল! কমলা লেবুকেও হার মানিয়ে দেয় অগ্নিবর্ণ আকাশ! পিনাকী কল্পনা করবার চেষ্টা করে পৃথিবীটা কমলালেবু। কমলা লেবুর মতন গোল, ঈষৎ চ্যাপ্টা, সূর্যের আলোয় লাল হয়ে ঘুরছে বন্‌বন্ ক'রে লাটিমের মত। রঘুনাথবাবু বলেন, পৃথিবীটা কত জোরে ঘুরছে জানিস,—ভীষণ শব্দে ঘুরছে, কিন্তু এমনি মজা, সেই শব্দ মানুষের কান দিয়ে শোনা যায় না। শোনা গেলে সঙ্গে সঙ্গে আমাদের কানের পর্দা ছিড়ে যেতো। শুধু কান কেন, শব্দের কাঁপুনিতেই সৃষ্টি ধ্বংস হয়ে যেতো। তাই শব্দময় হয়েও ভগবান এখনো নির্বাক, বুঝলি। প্রলয়ের রাত্রে শোনা যাবে ভগবানের ব্রহ্মাণ্ড হুঙ্কার।

ট্যা, ট্যা, ট্যা—ওটা কি? চিল, চিল উড়ে চলেছে, আকাশপথে। ওটা বোধ হয় বাচ্চা চিল, বোধ হয় তার মা বাবা কাউকেই খুঁজে পাচ্ছে না, তাই ডাকছে! উড়তে চায়, আরো উঁচুতে উড়বে একদিন। সেও যদি মানুষের ঘরে না জন্মে চিল হয়ে জন্মাতো, তা'হলে উড়ে যেত দ্বীপ হতে দ্বীপান্তরে। অনায়াসেই পার হয়ে যেত বে অব বেঙ্গল। বে অব বেঙ্গল মানে বঙ্গোপসাগর। এই দেশ, গোটা বাংলা দেশটা এক সময় সমুদ্রের গহ্বরে ছিল, ক্রমশঃ সমুদ্রের উপর ভেসে উঠেছে। প্রণমি তোমারে আমি সাগরোত্থিতে! মেজো মাসীর কবিতার বইতে লেখা আছে। কে কবি? নামটা আর স্মরণ নেই পিনাকীর।···

ঘুম, কৈ ঘুম তো আসছে না আজ? পিতলের পিলসুজের উপর রাখা মাটির প্রদীপে সরষের তেল। তার মধ্যে ডুবানো সলতে অনেকক্ষণ ধরে জ্বলে জ্বলে পুড়ে স্তিমিত হয়ে এসেছে, মনে হয় পিনাকীর। বাহিরে জ্যোছনার আলো অমাবস্যার তিথিতে ঢাকা। অন্ধকারে আসে ভূত-পেত্নী। চাঁদের আলোয় আসে ফুলপরীরা। ফুলবাগানে শেফালী গাছের তলায় ফুলপরীরা বোধ হয় এর

মধ্যেই নেমে এসে খেলা শুরু ক'রে দিয়েছে। গঙ্গাদা, বাবার ছাত্র, একবার নয়, দু'বার, তিনবার দেখেছে স্বচক্ষে। পিনাকীর ইচ্ছে হয় ফুলপরীদের দেখবে।

গা ছম্‌ছম্‌ করছে কেন? খাট থেকে নেমে আসে পিনাকী। মাটির প্রদীপে পোড়া দেশলাই কাঠি। কাঠিটা তুলে নিয়ে উসকে দেয় সলতেটাকে। প্রদীপের আলোর এবার অনেকখানি জোর বেড়েছে।

আলো-ছায়ার খেলা মায়ের মুখের উপর। কাত হয়ে শুয়ে আছেন মা। একদিকে আলো, অন্যদিকে ছায়া। ছট্‌ফট্‌ করতে করতে মা ঘুমিয়ে পড়েছেন। কতবার পিনাকী কাছে এসে বাতাস করতে চেয়েছিল···কিন্তু কিন্তু মা কেন রাগ করে? দরকার নেই, দরকার নেই, বাতাস করতে হবে না তোকে।···কাছে ঘেঁষে বসতেও দেয় না মা। কেবল বলে, খোকা, খোকা, যাও খেলগে যাও—থাক্‌, থাক্‌, বাতাস করতে হবে না আর,—তোর ঠাকুরমার কাছে শুবি রাত্রে, বুঝলি।

ঠাকুরমা, সদ্য রোগমুক্তা ঠাকুরমাও দুর্বল। অনেক আগেই খাটের উপর ঘুমিয়ে পড়েছেন। একলা মা, এত বড় ঘরটার মেজের উপর সামান্য ছেঁড়া তোশকের উপর শুয়ে আছে। শীর্ণা, কঙ্কালসার জননীকে কি ক'রে আরাম দেবে ভেবেই পায় না পিনাকী। খাটে শুলে মায়ের কষ্ট হয়, ওঠা-নামা করতে ভীষণ হাঁফ লেগে যায়। সেইজন্যেই, মায়ের নিজের ইচ্ছেতেই মেঝের উপর বিছানা পাতা। কিছুই করবার নেই কি? অকস্মাৎ পিনাকী নিজেকে অত্যন্ত অসহায় মনে করে। সে কেন এত ছোট থেকে গেল? তাড়াতাড়ি কেন বড়দের মতন উঁচু লম্বা হয়ে উঠলো না? গোঁফদাড়ি না বের হ'লে, ইংরেজিতে এম-এ, বি-এ পাস না করলে, ভাল চাকরি পাওয়া যায় না। পিনাকীর যদি একটা ভাল চাকরি থাকত তা'হলে তো আর মাকে মাটির ঘরে শুতে হোত না। পাখীর পালকে তৈরী গদী সব চেয়ে নরম। একটা পালকের গদী কিনতো সে, মা আরামে পাশ ফিরতো। টাকা, অনেক টাকা চাই।···

যদি পিনাকী সাবালক হ'য়ে, অর্থাৎ বাবার মতন বড় হয়ে,—নিলীমার বাবা যেমন কণ্ট্রাক্টর সেই রকম কণ্ট্রাক্টর হয়···কণ্ট্রাক্টরি করতে পারলে কাঁড়ি-কাঁড়ি টাকা, সারা ব্রিজের কণ্ট্রাক্টর কি যেন বলছিলেন নিলীমার বাবা সেদিন···।

সেই রাত্রে স্বপ্ন দেখে পিনাকী। মায়ের বিছানার তোশকের নীচে ছেঁড়া মাদুর, ছেঁড়া মাদুরের গা ঘেঁষে, খালি মাটির মেজের উপর ঢলে পড়েছিল কখন যেন সে। বাতাস করছিল মাকে। মায়ের নিষেধ শোনে নি। বাইরের বাতাসের শন্‌শনানি বেড়ে ওঠে ক্রমশঃ মেঘে মেঘে ঢেকে যায় আকাশ। ছিটে-ফোঁটা বৃষ্টি পড়ে। ঢেউখেলানো টিনের ছাউনির উপর শব্দ হয় পট, পট পটর। নারকোল

গাছগুলোর পাতার ফাঁকে-ফাঁকে চাঁদের আলো তখনো নিঃশেষে মিলিয়ে যায় নি। ঝিঁ ঝিঁ পোকার ডাক আর শোনা যায় না। এবার ডাক শুরু হয়েছে ব্যাঙের। সোনা ব্যাঙ, কালো ব্যাঙ, কুনো ব্যাঙ,—ছোট, বড়, মাঝারী, ডাকছে গ্যাঙ্‌র গ্যাং গ্যাঙ্‌র গ্যাং।··

ঘোর কৃষ্ণ কালো মূর্তি—এই কি যমরাজ?

অন্ধকারের চেয়েও কালো চোখ—একদৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে মায়ের দিকে?

কারা ওরা? বয়ে আনলো শব? বৃষ্টি-ভেজা ঘাসের সবুজ রঙ আর চোখে পড়ে না। কাশবনের পাশে ন্যাড়া অশত্থগাছের ডালগুলো দুলে ওঠে। শকুনির পাখার ঝাপটানি শোনা যায়। শিয়াল, হাজার হাজার শিয়াল—থমকে আছে কেন? পিনাকীর দিকে চেয়ে? লোলুপ, পাশব দৃষ্টি, লেজ নাড়ছে কি ওরা? ছায়া কালো, কালো—কঙ্কাল—প্রেতের মত অস্থিচর্মসার—বিষণ্ণ, বুভুক্ষু!—

···কার কণ্ঠস্বর?

···আগুন দাও।

···আগুন দাও। মায়ের মুখে আগুন। পীড়িতা, দারিদ্রক্লিষ্ট মায়ের অন্তিম আশা, আগুন জ্বলবে পিনাকী।

সহসা জ্বলে ওঠে লেলিহানে আগুনের শিখা।

বাতাসের বেগ বেড়ে চলে। হু হু ক'রে পুড়ে যায় পিনাকীর মা। সুন্দরী, কল্যাণময়ী রমা। কারা মন্ত্র পাঠ করছে শ্মশানে? কি আশ্চর্য! এ যে অরুমাসীর প্রিয় স্তব, পিনাকীর কণ্ঠস্থ—

মাতা ধরিত্রী জননী দয়ার্দ্র হৃদয়া সতী।
দেবী ভূরমণী শ্রেষ্ঠা নির্দোষা সর্বদুঃখহা॥
আরাধ্য মায়া পরম দয়া শান্তিঃ ক্ষমা গতিঃ।
স্বাহা স্বধা চ গৌরী মা পদ্মা চ বিজয়া জয়া॥

চিতা ভস্মাবশেষ। রাত্রির অন্ধকারে চিত্রার স্রোতের মধ্যে ফেলে দিয়েছে পিনাকী। এবার স্রোতের সঙ্গে ভেসে চলবে পরমাণু। পার হয়ে যাবে কত গ্রাম, শহর, গঞ্জ। সব শেষে মিশে যাবে সাগরের নীলজলে। বে অব বেঙ্গল, তারপর ভারত মহাসাগর। ভারত মহাসাগর কোথায় যেন গিয়ে মিশেছে, পিনাকীর আর জানা নেই সে কথা।···

সমাপ্ত

কাহিনী

শ্রীসুনীলকুমার বসু

অতি পুরাতন স্মৃতি বিজড়িত
ডাকিনী বুড়ীর চর,
মাটি যেথা আজ বালু ঢাকা আছে
ছিল সেথা বহু ঘর।

আর ছিল নদী, ছিল ছোট গ্রাম ;
নাম ভুলে গেছি ভাই,
তোমরা সকলে শোন মন দিয়া
যে কথা বলিতে চাই।

একদা সেথায় দীপের শিখায়,
আলোকিত ছিল প্রাণ।
মাটির কুটীরে নিত্য ঠাকুরে,
তারা যে শোনাতো গান।

বনের পাখীর কল-কাকলীতে
ঘুম ভেঙে যেত ভোরে,
শুরু হ'য়ে যেত কত শত কাজ
সারা দিনমান ধরে।

কৃষাণ চলিত বাহিরের কাজে
কৃষাণী থাকিত ঘরে,
অতি বুড়া-বুড়ী সজাগ থাকিত
ছোট শিশুদের তরে।

ফলে ফুলে ভরা নদীর দু'ধারে
ছিল কত সুখ শান্তি।
দূর হ'লো যবে মানুষের প্রেম
মুছে গেল সেই কান্তি।

গাঁয়ের মোড়ল ভাবিল যখন
সেই তো এখন রাজা,
তাই তো সেদিন বিনা দোষে পেল
ভিখারীর মেয়ে সাজা।

মোড়লের ছিল ভিন গাঁয়ে কোন
বিশেষ কাজের তাড়া,
তাহারি কুটীরে ভিখারিণী ছিল
দুয়ারের পাশে খাড়া।

ধাক্কা লাগিয়া পড়িল মাটিতে
ভিক্ষারি মৃৎ পাত্র।
তণ্ডুল কণা যা ছিল তাহাতে
রহিল না কিছু মাত্র।

সহসা রাগিয়া মোড়ল কহিল,
ওরে, ওরে হতভাগী!
কানা নাকি তুই, দূর'হ এখুনি ;
পাবি না ভিক্ষা মাগী।

মনে মনে বলে ভিখারিণী, প্রভু!
মোর কি মরণ নাই ?
ভীষণ প্লাবনে সারা গ্রামখানি
ভেসে গেল বুঝি তাই।

সেয়ানে * * সেয়ানে

শ্রীশচীন্দ্রনাথ অধিকারী

*

চারিদিকে ধূ ধূ করছে বিশাল মাঠ।

সেই বিশাল মাঠের মধ্যে ছোট্ট একটি রেল স্টেশন। কাছে-কিনারে লোকবসতি একেবারে নাই ; শুধু স্টেশনটির গায়ে ডোবার ধারে দু'একটা ছোট্ট চিঁড়ে-মুড়কি আর পান-বিড়ির দোকান।

ছোট্ট স্টেশনটিতে এবেলা-ওবেলা চারপাঁচখানা মাত্র ট্রেন থামে। এইমাত্র একখানা ট্রেন চলে গেছে। পরের ট্রেন আসবে চারপাঁচ ঘণ্টা পরে। নিদ্রিত কর্মহীন স্টেশন!

দুপুর বেলা। ঝাঁ ঝাঁ করছে রোদ। এমন সময় একজন গ্রাম্য ভদ্রলোক দুপুর রৌদ্রে গলদঘর্ম হ'য়ে পৌছুলেন স্টেশনের যাত্রীদের চালায়। রৌদ্রে অনেকখানি পথ হেঁটে এসে খুব শ্রান্ত-ক্লান্ত-দেহে আশ্রয় পেলেন স্টেশনের ছাউনির মধ্যে, বেঞ্চিতে বসে হাঁফাতে লাগলেন। মাঠের হাওয়ায় একটু সুস্থ হলেন। তিনি দেখতে পেলেন নির্জন স্টেশনটিতে একজন ভদ্রলোক দিব্বি স্নান-টান সেরে আহারাদি করে শতরঞ্চি বিছিয়ে মাথার কাছে পোঁটলা-পুঁটলী রেখে বিশ্রাম করছেন। আরাম করে পান চিবুচ্ছেন।

জনপ্রাণী নেই। দু'জন মাত্র যাত্রী গাড়ীর আশায় বসে। চারপাঁচ ঘণ্টা পরে ট্রেন আসবে। তাই আগন্তুক ভদ্রলোকটি বিশ্রামরত ভদ্রলোকটির সঙ্গে আলাপ জুড়ে দিলেন।—

মহাশয়ের নাম?

ভদ্রলোকটি আরাম ক'রে বসে জবাব দিলেন—আজ্ঞে আমার নাম ওষ্ঠলাল।

আগন্তুক ভদ্রলোকটি হেসে তাঁর দিকে চেয়ে বললেন—মশায়ের নিবাস?

ওষ্ঠলাল—আজ্ঞে, নিখোঁজ-ডাঙা।

আগন্তুক আরো একটু হেসে জিজ্ঞাসা করলেন—কোথায় যাবেন?

ওষ্ঠলাল—আজবগঞ্জ।

আগন্তুক হেসে উঠলেন, বললেন—বেশ, মশায়ের সঙ্গে আলাপ করে সুখী হলাম ; তা, গ্রাম থেকে কিসে এলেন?

ওষ্ঠলাল—আজ্ঞে, এসেছি খুব আরামে। এসেছি চরণমাঝির নৌকায়।

আগন্তুক হোঃ হোঃ করে হেসে বললেন—আপনি বেশ রসিক লোক। এই মাঠের মধ্যে তো কুয়ো পুকুর নেই। স্নান করলেন কোথায়?

ওষ্ঠলাল—স্নান করেছি ঘটি-গঙ্গায়।

আগন্তুক—আবার হেসে বললেন—বেশ, বেশ। কিন্তু ট্রেনের তো অনেক দেরি, স্নানটিও সেরে নিয়েছেন, আহারাদিও সেরেছেন। মশায়ের কী করা হয়?

ওষ্ঠলাল—চাকরি করি বঙ্গলক্ষ্মী মিলে।

আগন্তুক ভদ্রলোকটি পথশ্রম ভুলে বেশ খানিক হেসে নিলেন।

এইবারে ওষ্ঠলাল আলাপ জমিয়ে নিলেন। জিজ্ঞাসা করলেন—মশাই-এর নাম?

আগন্তুক—আজ্ঞে আমার নাম অধরকালি।

ওষ্ঠলাল রসিক মানুষ তিনি হো হো ক'রে হেসে বললেন—বেশ নামটি তো আপনার। আসছেন কোথা থেকে?

অধরকালি—আসছি নয়চর থেকে।

ওষ্ঠলাল—একটু ভেবে নিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, এ্যাতটা পথ আপনি এলেন কিসে?

অধরকালি—এসেছি পদাতিক সিং-এর গাড়িতে।

ওষ্ঠলাল—বেশ, বেশ। নামকরা গাড়োয়ানের গাড়িতেই এসেছেন। তা আহারাদি কি হয়েছে?

অধরকালি—হ্যাঁ, পেট ভ'রে বাতাসা খেয়েছি। আর কি খাবো?

ওষ্ঠলাল—মশায়ের যাওয়া হবে কোথায়?

অধরকালী—আমাকে যেতে হবে অসীমদহে।

ওষ্ঠলাল হো হো ক'রে হেসে বললেন—বেশ, বেশ, মশায়ের কী করা হয়?

অধরকালী জবাব দিলেন—আমি ভারতনারায়ণ মিলে চাকরি করি।

ওষ্ঠলাল আবার হো হো ক'রে হেসে উঠলেন। আলাপ পরিচয় আরো জমে উঠলো। দুই রসিকে বেশ গল্প জমিয়ে নিলেন।

এই দু'জন ভদ্রলোকের আলাপের অর্থটা কী, তা তোমরা বুঝতে পেরেছ নিশ্চয়ই। না পেরে থাকো তো শোনো। সেকালে সাধারণ অল্পশিক্ষিত মানুষের মধ্যে এই রকম সরল আলাপ চলতো। পাঁচালী ও কবিগানেও এইরকম বুদ্ধির লড়াই চলতো—এইটেই ছিল সেকালের সামাজিক অঙ্গ। উচ্চশিক্ষার অভাবেও এদের মন নিজেদের অল্প পরিসরের মধ্যে সৃষ্টির আনন্দে সরস হয়ে থাক্‌তো; সরল সরল কৌতুক আমাদের সেকালের সামাজিক পরিবেশ আনন্দময় করে রাখতো।

পান খেয়ে ঠোঁট লাল করে ওঁর নাম হল ওষ্ঠলাল, আর বাড়ি কিনা নিখোঁজ-ডাঙা। বুদ্ধি-দীপ্ত সরস রসিকতা নয় কি?

যাওয়া হবে আজবগঞ্জ, অর্থাৎ আজিমগঞ্জ। এলেন কিসে? চরণমাঝির নৌকায়—কী সুন্দর

অর্থপূর্ণ রসিকতা। স্নান হল ঘটি-গঙ্গায়, চাকরি করেন বঙ্গলক্ষ্মী মিলে! একেই বলে হালফ্যাসানের 'টিড বিটস্' (Tid-bits)।

দ্বিতীয় ভদ্রলোকটি কিন্তু প্রথম জনকেও টেক্কা মেরেছেন। রৌদ্রে হেঁটে শ্রান্তক্লান্ত হয়ে মুখ শুকিয়ে গেছে তাই তিনি 'অধরকালী'—'ওষ্ঠলালের' নামের সঙ্গে পাল্লা দেওয়া হল। তাঁর বাড়ী 'নয়চর' অর্থাৎ নবদ্বীপ। এলেন কিসে? 'পদাতিক সিং-এর গাড়িতে।' 'চরণ মাঝির' নৌকার প্রত্যুত্তরে চমৎকার অর্থপূর্ণ ইঙ্গিত। এদের কাছে কোথায় লাগে ইলেকট্রিক ট্রেন। ইনি খেয়েছেন 'বাতাসা' অর্থাৎ বায়ুভক্ষণের নামান্তর। যাবেন কোথায়? 'অসীমদহে'। খুঁজে বার করো দেখি সেই শহরটাকে। চাকরি করেন ওষ্ঠলাল 'বঙ্গলক্ষ্মী-মিলে'। অধরকালীও টেক্কা দিলে—তার চাকরি 'ভারত নারায়ণ মিলে'—'বঙ্গলক্ষ্মীর' চেয়েও বড় মিল নিশ্চয়! এদের দু'জনের বুদ্ধি রসিকতা ইস্কুল-কলেজের শিক্ষায় বিকশিত হয় নি। বাংলাদেশের নরম মাটির রস থেকেই এদের মন ও বুদ্ধি সরস হয়েছে। এরই নাম সেয়ানে সেয়ানে কোলাকুলি!

তখনকার পাঁচালীর ছড়া যাঁরা বাধতেন তাঁরা বি-এ, এম-এ পাস বুঝতেন না; কবিরত্ন বিদ্যারত্ন উপাধিও পান নি। তাঁদের পাঁচালী রচনার নমুনা দুই একটা শোনাচ্ছি—'ওরে রে লক্ষ্মণ একী অলক্ষণ, বিপদ ঘটেছে বিলক্ষণ—' রামায়ণের গানে এই গান সবাইকে কাঁদাতো। আবার ভাবো 'শ্রীকান্ত নরকান্তকারীকে নিতান্ত-কৃতান্ত-ভয়ান্ত-হবে ভবে।' বাংলা ভাষার উপর কতখানি দখল থাকলে এই রকম পদ রচনা করা যায়! এর সঙ্গে মিলিয়ে নাও রবীন্দ্রনাথের অপূর্ব ছন্দঝঙ্কার 'শঙ্কিত চিত কম্পিত অতি অঞ্চল ওড়ে চঞ্চল।' এর সঙ্গে কোন সেকেলে মাস্টার মশায়ের একই শব্দের বিভিন্ন অর্থপূর্ণ-পদ্যটির মানে বল দেখি—

'হরির উপরে হরি, হরি শোভা পায়,
হরিরে দেখিয়া হরি, হরিতে লুকায়।'

সেকালের 'সমস্যাপূরণ' খুব মজার খেলা ছিল নানারকম সামাজিক আসরে। উদ্ভট কবিতাও সে সময় রচিত হত প্রচুর। কবির লড়াই-এর অনুকরণে এগুলি রচিত হত। যেমন একজন একটা অদ্ভুত কবিতার লাইন বলে উত্তর চাইলেন—যেমন অসম্ভব তেমনি অদ্ভুত কথা—'গাভীতে ভক্ষণ করে সিংহের শরীর।'

সমস্যা বটে, অসম্ভব কাণ্ড, গুলিখুরী প্রশ্ন। কী চমৎকার জবাব দিলেন রসসাগর কবি কৃষ্ণচন্দ্র ভাদুড়ী শোনো—

'মহারাজ, রাজধানী নগর বাহির
বারোইয়ারী-মা ফেটে হলেন চৌচির

ক্রমে ক্রমে খড় দড়ি হইল বাহির
গাভীতে ভক্ষণ করে সিংহের শরীর।'

প্রাচীন কবি ভারতচন্দ্রের অন্নদামঙ্গলে 'অন্নদার আত্মকাহিনী'—'কোনো গুণ নাহি তার কপালে আগুন' কবিতাটি অপূর্ব ও অদ্ভুত। তিনি ছিলেন একজন খ্যাতিমান শ্রেষ্ঠ কবি, তাঁর ছিল ক্ষুরধার বুদ্ধির দীপ্তি আর অপূর্ব কবিত্ব। কাশীরামদাসের মহাভারতের পয়ারেও এই শ্রেণীর সুন্দর কবিতা দেখা যায়। এ্যাণ্টনী ফিরিঙ্গী প্রভৃতি বিখ্যাত কবিয়ালদের কলম দিয়ে যে সব গান জন্ম নিতো তার মধ্যে অশিক্ষিত কবিদের কাব্যপ্রতিভা ছিল যথেষ্ট। একজন প্রতিভাধর প্রাচীন সাহিত্যিক এই কলকাতা শহরের কাশীপ্রসাদ ঘোষের একটি সরস্বতীর স্তোত্রে 'শ্বেত' শব্দের কত সুন্দর রকমারী ব্যবহার দেখা যাচ্ছে লক্ষ্য কর—

'শ্বেত শতদলোপরে শ্বেতাম্বর কলেবরে
শ্বেতমালা গলে পরে বিরাজে শ্বেতবরণী।'

কাশীপ্রসাদ (১৮০৯-১৮৭৩) ইংরাজীতেও সুপণ্ডিত ছিলেন। সহজ সরল সেকেলেভাবের কবিতা তাঁর ছিল অনেক। সুবিখ্যাত পণ্ডিত রিচার্ডসন্ সাহেব তাঁর একটি কবিতা 'The Boatmans' song to Ganga' নামে ইংরাজীতে অনুবাদ করেছিলেন।

সহজ সরল সেকালের বাঙালীর মনের মধ্যে মধুচক্রের মত রস টস্‌টস্ করতো! কবিতা আর গান ছিল অনেকের প্রকৃতি-দত্ত অধিকার। প্রাচীন পল্লীগীতির অফুরন্ত ভাণ্ডার বাংলার হৃদয়ে। তার সঙ্গে মিশেছিল সহজ জ্ঞান ও বুদ্ধি। মহাকবি কালিদাস কাব্য-নাটকাদি লিখে গেছেন সংস্কৃতে। কিন্তু সেকেলে গেঁয়ো কবিরা কল্পনা দিয়ে কালিদাসকেও বাঙালী করে গ'ড়ে নিয়ে তাঁর রচনা ব'লে নিজেদের অনেক পদ্য অথবা ছড়া চালিয়ে আমাদের মুগ্ধ করেছেন। যেমন কালিদাস একটা ল্যাজ কাটা কুকুর দেখে দুঃখু ক'রে পদ্যরচনা করে ফেললেন—

'নাই তাই খাচ্চ, থাকলে কোথায় পেতে?
কহেন কবি কালিদাস পথে যেতে যেতে।'

ল্যাজকাটা কুকুরের কাটা ঘায়ে মাছিরা বসেছে দেখে কবি মাছিদের উদ্দেশে বলছেন—কুকুরের লেজ নেই তাই বসে ওর ঘা খাচ্ছ; কিন্তু বাপু, ও বেচারার ল্যাজটা থাকলে তো আর তা পেতে না। ল্যাজ নেড়ে তোমাদের তাড়াতো। কী চমৎকার হাসির ব্যাপার!

এই রকম আরো সরল সরল কৌতুকপূর্ণ রচনার কাহিনী বলতে পারি, যদি তোমরা এদিকে কিছুটা কৌতূহল দেখাও। কবি ঈশ্বরগুপ্ত তাই বলে গেছেন—

'এত ভঙ্গ বঙ্গদেশ তবু রঙ্গভরা।'

তুলসী খাও

ডাঃ শচীন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত

তুলসীর বিষয়ে তোমাদের কিছু বলব। তুলসী কারুর নাম নয়—একপ্রকার গাছ। আমাদের বাংলাদেশে, শুধু বাংলা দেশ কেন, সমগ্র ভারতবর্ষে এই গাছ দেখতে পাবে। তুলসী গাছ তোমরা নিশ্চয় দেখেছ—এ খুব বড় হয় না। ছোট ছোট চারাগাছের মতন। এমনকি কচি কচি ছেলে-মেয়েরাও টুক্ টুক্ করে তুলসী পাতা ছিঁড়ে নিতে পারে। তুলসীগাছ যেখানে-সেখানে জন্মায়। এদের বীজ হতেই গাছ জন্মায়। আমরা—মানে হিন্দুরা, তুলসীগাছকে নারায়ণ বলে মনে করি। পূজা-পার্বণে তুলসী প্রয়োজন। আমাদের দেশের বৈষ্ণবগণের নিকটও তুলসী খুব পবিত্র। তাঁদের বিশ্বাস একটি তুলসী পাতা নারায়ণের মাথায় দিলে তিনি তাতেই খুশী। তুলসী-মাহাত্ম্য সম্বন্ধে অনেক সুন্দর সুন্দর গল্প আছে। বিষ্ণুপুরাণে এর অনেক উপাখ্যান পাওয়া যায়। তোমরা বড় হয়ে সে-সব পড়বে।

তুলসী সম্বন্ধে অনেক প্রবাদ শোনা আছে। আমাদের দেশের মুনিরা বলে থাকেন,—তুলসীর গন্ধ বায়ু যতদূর বহন করে নিয়ে যায়, ততদূর প্রাণীসকল পবিত্র হয়। তুলসীর গুণ অনেক। নারায়ণ পূজার চরণামৃত পান (মানে নারায়ণের চরণামৃতে তুলসী থাকে—সে জন্যই উহা খুব পবিত্র) ও তুলসীতলার মাটি গায়ে যাঁরা মাখেন, তাঁরা অনেক কঠিন রোগ হ'তে মুক্ত হতে পারেন—যদিও ইহা আমার শোনা কথা, তথাপি আমার বিশ্বাস এর মধ্যে যথেষ্ট সত্য নিহিত রয়েছে।

তুলসীর সর্বশ্রেষ্ঠ গুণ হ'ল,—পচন নিবারণ করে, দুর্গন্ধ নষ্ট করে। সেজন্য রোগের জীবাণু ধ্বংস করবার শক্তি তুলসীর খুব আছে। পানীয় জলে তুলসীপাতা দিলে, জলের দূষিত জীবাণু নষ্ট করে জলকে পবিত্র করে দেয়। তুলসী-ভিজান জল পান করলে কলেরাও হয় না। আমাদের দেশে একটি ভাল প্রথা আছে—কেউ মারা গেলে, তাঁর শবদেহ বহন করে নিয়ে যাবার সময় সঙ্গে করে তুলসী-বৃক্ষ নিয়ে যায়। গ্রামের শ্মশানে গেলে এরূপ দৃষ্টান্ত অনেক পাবে। শ্মশানের চারিধারে অনেক তুলসীগাছ পাবে, কারণ যারা তুলসীবৃক্ষ সঙ্গে করে নিয়ে যায়, তারাই ঐ বৃক্ষকে মাটিতে পুঁতে আসে। ইহার যথেষ্ট কারণ আছে। তুলসীগাছের হাওয়া শ্মশানে যে দুষ্ট জীবাণু থাকে তা ধ্বংস করে, এবং শববহনকারীরা ঐ জীবাণুর হাত হ'তে রক্ষাও পায়।

আবার দেখা যায়—কারুকে বোলতা, ভীমরুল, এমনকি বৃশ্চিকে যদি কামড়ায় এবং সে স্থানে যদি তুলসী পাতার রস লাগান হয়, তাহ'লে তৎক্ষণাৎ সেই দংশনের জ্বালা-যন্ত্রণা দূর হয়ে চলে যায়। কানের ব্যথাতে কেউ যদি অস্থির হয়ে ওঠে, তাকেও যদি তুলসীর পাতার রস কানে দেওয়া

যায় তার কানের ব্যথাও সঙ্গে সঙ্গে চলে যাবে। অনেক মতে সর্প-দংশনের রোগীকে তুলসী পাতার রস খাওয়ালে সাপের বিষও নষ্ট হ'তে পারে।

যেখানে ম্যালেরিয়া রয়েছে, সে সব স্থানের বাড়ীর চতুর্দিকে যদি তুলসীবৃক্ষ লাগান যায়, তা হ'লে সেখানে ম্যালেরিয়ার বিষ প্রবেশ করতে পারে না। মজার কথা হ'ল—তোমরাও পরীক্ষা করে দেখতে পার। ম্যালেরিয়ার জীবাণুবাহী মশক—যেখানে তুলসী গাছ আছে সেখানে থাকে না। তার কারণ তারা তুলসীর হাওয়া সহ্য করতে পারে না। আবার যদি তুলসী পাতার রস গায়ে মেখে শোও, দেখবে মশা তোমার গায়ে বসবে না। যেখানে ম্যালেরিয়ার প্রকোপ খুব বেশি, সেখানকার লোকেরা যদি প্রতিদিন নিয়মিত ভাবে, সকালে খালি পেটে সাতটা করে তুলসীর পাতা খায়, তাকে কখন ম্যালেরিয়া স্পর্শ করবে না। এমন কি তুলসী পাতার রসে পুরাতন ম্যালেরিয়াও চলে যায়।

অনেকের ধারণা যে-বাড়ীতে তুলসী গাছ আছে, সে-বাড়ীতে কখনও বজ্রপাত হয় না। তুলসী গাছের ছালের রসে শরীরে বল ও কান্তি হয়। ঐ মূল যদি পানের সঙ্গে খাওয়া যায়, মাথা ঠাণ্ডা থাকে, ঘুম ভাল হয়।

যে সব লোক অত্যধিক চা পান করেন। তাঁরা যদি কতকগুলি তুলসী পাতা ছায়ায় শুকিয়ে নিয়ে রেখে দেন, এবং পরে ঐ শুকনো পাতা চায়ের মতন দুধ চিনি দিয়ে পান করেন, দেখতে পাবে—চায়ের দরুণ যে ক্ষতি হচ্ছে—তা আর হবে না। চায়ের নেশাও চলে যাবে—হজমও ভাল হবে। দেখতে দেখতে দেহের কান্তি সুন্দর হবে। যারা নিয়মিতভাবে তুলসী সেবন করেন—তাঁদের কখন কাশীতে কষ্ট পেতে হয় না। তুলসী সম্বন্ধে আরো অনেক বিষয় আছে যা বড় হ'লে তোমরা পড়বে। আজ এ পর্যন্ত।

প্রশ্ন

শ্রীমধুসূদন চট্টোপাধ্যায়

পিতার শ্রাদ্ধে বাবুর বাড়িতে
মহা ধূমধাম চলে ঃ
অগুণতি তার বন্ধুরা এসে
খেয়ে যায় দলে-দলে।

দুয়ারে যে এক অনাহারী কাঁদে
কে-ই বা দেখে তা চেয়ে ?
বিশ্বপিতার তৃপ্তি কি হয়
হেন অপমান পেয়ে ?

খেলাধুলার খবর

মেঠুড়ে

অ্যাসেজ জয়ী অস্ট্রেলিয়া

ইংলণ্ড বনাম অস্ট্রেলিয়ার চতুর্থ টেস্ট ক্রিকেট ম্যাচের ষষ্ঠ ও শেষ দিনে অস্ট্রেলিয়া দল দশ উইকেটে ইংলণ্ডকে হারিয়ে দিয়ে 'অ্যাসেজ পুনরুদ্ধার' করেছে। চতুর্থ টেস্ট ম্যাচে জয়লাভের ফলে অস্ট্রেলিয়া বর্তমান পর্যায়ের খেলায় ৩-০ ম্যাচে রাবার লাভ করেছে। ১৯৫৩ সালে ইংলণ্ড অস্ট্রেলিয়াকে হারিয়ে দিয়ে 'অ্যাসেজ' দখল করেছিল এবং এতোদিন তা তাদেরই ঘরে ছিল। ১৯৫৩ সালের আগে অস্ট্রেলিয়া একসঙ্গে উনিশ বছর অ্যাসেজের অধিকারী ছিল।

—

পঞ্চম ক্রিকেট টেস্ট ম্যাচ

নয়াদিল্লীতে ভারত বনাম ওয়েস্ট ইণ্ডিজের পঞ্চম ও সবশেষ টেস্ট ম্যাচ অমীমাংসিত ভাবে শেষ হয়। ভারত দ্বিতীয় ইনিংসে নয় উইকেটের বিনিময়ে ২৭৫রান করলে ঐ অবস্থাতেই খেলাটির ওপর ছেদ পড়ে, কারণ আহত উমরিগড় আর ব্যাট করতে নামতে পারেন নি এবং ওয়েস্ট ইণ্ডিজের দ্বিতীয় ইনিংস শুরু করার আর সময় ছিল না। প্রথম ইনিংসে সেঞ্চুরী করার পর দ্বিতীয় ইনিংসে ৯৬রান করে চান্দু বোরদে দিনের শেষ ওভারে আউট হন।

টেস্ট খেলার ইতিহাসে বোরদের নাম ভারতের 'ত্রাণকর্তা' হিসেবে স্মরণীয় হ'য়ে থাকবে। এর আগে মাত্র একজন ভারতীয় ব্যাটসম্যান বিজয় হাজারে টেস্ট ম্যাচে দু' ইনিংসে সেঞ্চুরী করেছেন। হাজারে ১৯৪৮-৪৯ সালে অস্ট্রেলিয়ার সঙ্গে টেস্ট পর্যায়ের খেলায় এডেলেডে চতুর্থ টেস্ট ম্যাচে ১১৬ ও ১৪৭ রান করেছিলেন। বর্তমান পর্যায়ের টেস্ট খেলায় একমাত্র বোরদেই আগন্তুকদলের বিপক্ষে শতাধিক রান করেছেন। ওয়েস্ট ইণ্ডিজের ছ-জন ব্যাটসম্যান ভারতের বিপক্ষে মোট নটি সেঞ্চুরী করেছেন। গারফিল্ড সেবার্স ৩টি, বেসিল বুচার ২টি এবং কানহাই, জন হোল্ট, কোনি স্মিথ ও জো সলোমন এঁরা প্রত্যেকে একটি করে সেঞ্চুরী করেছেন।

কানহাইকে 'বাঘের মাথা' উপহার

গত ৯ ফেব্রুয়ারী রাষ্ট্রপতি ভবনে রাষ্ট্রপতি ডাঃ রাজেন্দ্রপ্রসাদ ওয়েস্ট ইণ্ডিজ ক্রিকেট দল এবং ভারতীয় ক্রিকেট দলের খেলোয়াড়দের চায়ের আসরে নিমন্ত্রণ জানান। ভারতের বিপক্ষে টেস্ট খেলায় ব্যক্তিগত সর্বোচ্চ সংখ্যক রান করার জন্যে রাষ্ট্রপতি রোহন কানহাইকে 'বাঘের মাথা' উপহার দেন। কলকাতায় তৃতীয় টেস্ট ম্যাচে রোহন কানহাই ২৫৬ রান করেছিলেন। বিজয়-নগরের মহারাজকুমার রাষ্ট্রপতির হাতে এই 'বাঘের মাথা'টি দিয়েছিলেন।

—

জন-সম্বর্ধিত চান্দু বোরদে

ওয়েস্ট ইণ্ডিজের সঙ্গে দিল্লীতে পঞ্চম টেস্ট ম্যাচে অসামান্য ক্রীড়ানৈপুণ্য প্রকাশ করায় চান্দু বোরদেকে বরোদায় জন-সম্বর্ধনা জানান হয়। সম্বর্ধনা সভায় তাঁকে চার হাজার টাকার একটি তোড়া উপহার দেওয়া হয়। এই সভায় ইংলণ্ড-গামী ভারতীয় দলের অধিনায়ক দাতাজীরাও গায়কোয়াড় ও দলে নির্বাচিত বরোদার অপর খেলোয়াড় জে. এম. ঘোরপাড়েকেও সম্বর্ধনা জানান হয়।

—

ইংলণ্ডগামী সতেরোজন খেলোয়াড়

ইংলণ্ডগামী ভারতীয় ক্রিকেট দলের খেলোয়াড় নির্বাচন শেষ হয়েছে। এই দলে আছেন দাতাজীরাও গায়কোয়াড় (অধিনায়ক), পঙ্কজ রায় (সহ-অধিনায়ক), নরি কণ্ট্রাক্টর, পি. জি. যোশী (উইকেট রক্ষক), জে. এম. ঘোরপাড়ে, কৃপাল সিং, আর. জি নাদকারনি, জয়সিমা, অরবিন্দ আপ্তে, গোলাম আহমদ, পলি উমরিগড়, তামানে (উইকেট রক্ষক), মঞ্জরেকার, সুরেন্দ্রনাথ, সুভাষ গুপ্তে, রামকান্ত দেশাই ও সি. জি. বোরদে।

ইংলণ্ডে ভারত বনাম ইংলণ্ডের পাঁচটি টেস্ট খেলার তারিখ :

৪—৯ জুন ট্রেণ্টব্রিজে ১ম টেস্ট। ১৮—২৩ জুন লর্ডসে ২য় টেস্ট। ২—৭ জুলাই লীডসে ৩য় টেস্ট। ২৩—২৮ জুলাই ওল্ড ট্র্যাফোর্ডে ৪র্থ টেস্ট। ২০—২৫ আগস্ট ওভালে ৫ম টেস্ট।

—

লিণ্ডওয়ালের কৃতিত্ব

টেস্ট পর্যায়ের খেলায় এ পর্যন্ত মাত্র তিন-জন বোলার দুশোর ওপর উইকেট লাভের কৃতিত্ব অর্জন করেছেন। তাঁদের ভেতর ইংলণ্ডের আলেক বেডসার সবচেয়ে বেশি (২৩৬টি) উইকেট লাভ করেছেন। এটাই বর্তমানের বিশ্ব-রেকর্ড। অস্ট্রেলিয়ার বোলারদের ভেতর ক্ল্যারি গ্রিমেট এতোদিন পর্যন্ত সবচেয়ে বেশি সংখ্যক (২২৬টি) উইকেট লাভের রেকর্ডের অধিকারী ছিলেন। বর্তমান পর্যায়ের টেস্ট খেলায় অস্ট্রেলিয়ার রে লিণ্ডওয়াল চতুর্থ ও পঞ্চম টেস্ট ম্যাচে ৭টি উইকেট লাভ করে ক্ল্যারি গ্রিমেটের অস্ট্রেলীয় রেকর্ড অতিক্রম করেছেন এবং ২১৯ উইকেটের নতুন রেকর্ড স্থাপন করেছেন। তিনজনের ভেতর লিণ্ডওয়ালের গড় হিসেবই শ্রেষ্ঠ। নিচে তিনজন বোলারের রেকর্ডের একটা হিসেব দেওয়া হল :

	টেস্ট	রাণ	উইকেট	গড়
আলেক বেডসার	৫১	৫৮৭৬	২৩৬	২৪.৮৯
রে লিণ্ডওয়াল	৫৭	৪৯১৩	২১৯	২২.৪৩
ক্ল্যারি গ্রিমেট	৩৭	৫২৩১	২১৬	২৪.২১

—

দঃ কলঃ স্কুল ভলিবল লীগ

২২ ফেব্রুয়ারী কালীঘাট পার্কে আই. এস. এস. এ দক্ষিণ কলকাতা পরিচালিত আন্তঃ স্কুল ভলিবল লীগের চ্যাম্পিয়ানশিপ খেলায় যাদবপুর আদর্শ শিক্ষায়তন ১৫।০, ১৩।১৫, ১৬।১৪ এবং ১৫।১২ পয়েণ্টে চক্রবেড়িয়া হাই স্কুলকে হারিয়ে দিয়ে পরপর দু'বার চ্যাম্পিয়ানশিপ লাভ করেছে।

—

ইংলিশ চ্যানেল সন্তরণে প্রস্তুতি

ইংলিশ চ্যানেল অতিক্রম করার প্রস্তুতি হিসেবে সিটি কলেজের ছাত্রী আরতি সাহা ১ মার্চ দেশবন্ধু পার্কস্থ পুষ্করিণীতে অবিরাম সাঁতারের এক মহড়া দেন। হাটখোলা ক্লাবের সদস্যা এবং বিশ্ব অলিম্পিক প্রত্যাগত সাঁতারু আরতি সাহার সাঁতার দেখার জন্যে সেদিন সাধারণের বিশেষ আগ্রহের ভাব দেখা গিয়েছিল। আরতি সাহা সকাল সোয়া ন'টায় দেশবন্ধু পার্কের ৬৫ মিটার সুইমিং পুলে নেমে বেলা সোয়া পাঁচটা পর্যন্ত ১৬০ বার পারাপার হয়ে ৮ ঘণ্টায় ১৬,৯০০ মিটার (দশ মাইলের কিছু কম) অতিক্রম করেন।

—

আন্তঃ স্কুল এ্যাথলেটিক

গত ৬ মার্চ ইণ্ডিয়ান স্কুল স্পোর্টস এসোসিয়েশন কলকাতা পরিচালিত উনবিংশ বার্ষিক আন্তঃস্কুল এ্যাথলেটিক স্পোর্টস রাজস্থান মাঠে বিপুল উৎসাহ ও উদ্দীপনার ভেতর শেষ হয়। কলকাতার বিভিন্ন ইস্কুলের প্রায় দেড়শ ছাত্র এই প্রতিযোগিতায় অংশ গ্রহণ করে। সিটি কলেজিয়েট স্কুলের ছাত্রেরা স্কুল চ্যাম্পিয়নসিপ লাভ করে বিশেষ কৃতিত্বের পরিচয় দেয়।

—

হাইজাম্পে বিশ্বের রেকর্ড ভঙ্গ

বোস্টনের সতেরো বছরের নিগ্রো ছাত্র টমাস এ্যামেচার এ্যাথলেটিক ইউনিয়নের ইনডোর প্রতিযোগিতায় ৭ফু. ১$\frac{1}{2}$ ইঞ্চি লাফিয়ে হাইজাম্পে বিশ্বের অনুমোদিত রেকর্ড ভেঙে দিয়েছেন। হাইজাম্পে অনুমোদিত বিশ্ব-রেকর্ড আছে রাশিয়ার ইউরি স্টেপানভের ৭ফু. ১ইঞ্চি। তিনবারের চেষ্টায় টমাস ৭ ফু. ১$\frac{1}{2}$ ইঞ্চি অতিক্রমে সমর্থ হন।

—

জাতীয় এ্যাথলেটিক প্রতিযোগিতা

ত্রিবান্দ্রমে অনুষ্ঠিত জাতীয় এ্যাথলেটিক প্রতিযোগিতায় পশ্চিম বাঙালার শ্রীমান সমর সরকার ১৯ ফু, ৭$\frac{3}{4}$ ইঞ্চি ব্রডজাম্প করে কিশোর বিভাগে তাঁর নিজের রেকর্ড স্পর্শ করেন। শ্রীমান সরকার হাইজাম্প ফাইনালেও বিশেষ কৃতিত্বের পরিচয় দেন। সমর সরকার ৫ ফু. ৭$\frac{3}{4}$ ইঞ্চি লাফিয়ে তাঁর নিজের ভারতীয় রেকর্ড (৫ ফু. ৬ ইঞ্চি) ম্লান করে দেয়।

—

গ্রাহক গ্রাহিকাদের লেখা

বিদ্যাসাগর

বিদ্যার সাগর তুমি অনুপম গুণী,
তোমার গুণের কথা সর্বমুখে শুনি।
ভণ্ড লোকে করে শুধু মুখের বড়াই,
কাজের মানুষ তুমি, মিথ্যা দম্ভ নাই।
দৃঢ় করে অসত্যের বুকে হান শূল,
দুঃখীর বেদনা হেরি কাঁদিয়া আকুল।
কাঁধে করে তুলে নিলে পথের আতুর—
সেবা-যত্নে অভাগার ব্যথা হল দূর।
তুমি আজ স্বর্গধামে, আছে তব বাণী—
জন্মেছি তোমার দেশে, তাই ধন্য মানি॥

শ্রীময়ূখ বসু

আমাদের ইস্কুল

(প্রবন্ধ প্রতিযোগিতার তৃতীয় পুরস্কারপ্রাপ্ত)

স্কুল অনেক রকম আছে—ছোট, বড়, গভর্ণমেণ্ট, মিশনারী ও পাবলিক স্কুল। আমাদের স্কুল হচ্ছে ভারতবর্ষের মধ্যে একটি নামকরা পাবলিক স্কুল। এর নাম—"রাজকুমার কলেজ।" নাম দেখে যদিও মনে হয় যে এটি কলেজ এবং খালি রাজকুমারদের জন্য, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তা নয়।

কলিকাতা থেকে রেলে নাগপুর যাবার পথে প্রায় ৫১৫ মাইল দূরে রায়পুর বলে একটি শহর আছে। এই শহরটি মধ্যপ্রদেশের এলাকাভুক্ত। এইখানেই আমাদের স্কুল, যদিও এটির নাম কলেজ। স্কুলের মধ্যে ঢুকলেই দেখা যায় বিরাট মাঠ, লাল রস্তার দু' পাশে ফুটবল, হকি ও ক্রিকেট খেলার মাঠ। রাস্তার দু'পাশ ফুল গাছে ভরা। দূরে দূরে দেখা 'যায় মাষ্টার মশায়দের কোয়ার্টার। একটু এগিয়ে গেলে সামনেই ছোট একটি বাগান, তাকে ঘুরে গেলই একটি প্রকাণ্ড বাড়ী পাওয়া যাবে। এইটাই হচ্ছে আমাদের স্কুল। স্কুলের উপরে একটি ঘড়ী আছে। এই ঘড়ীটি ট্রেনে যাবার সময়ও দেখতে পাওয়া যায়। শোনা যায় যে, যখন এই ঘড়ীটি আগে বাজতো, তখন সারা শহরে তার আওয়াজ শোনা যেত। কিন্তু এর আওয়াজে পড়াশুনার অসুবিধার জন্য এই ঘড়ীটির বাজা এখন বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। এই ঘড়ীটি এখনও চলে, কিন্তু বাজে না।

স্কুলের ভিতরে ঢুকলেই প্রথমে দেখা যায় একটি বিরাট হল। এটি হচ্ছে গ্রন্থাগার। এখানে

বিভিন্ন বিষয়ের নানা রকম বই আছে। এটি রায়পুর শহরের মধ্যে একটি বিখ্যাত গ্রন্থাগার। এর পরেই হচ্ছে থিয়েটার হল। এই হলটির নাম "স্টো" ভবন। স্কুলের ভূতপূর্ব সর্বজনপ্রিয় প্রিন্সিপালের নামে এই হলের নামকরণ হয়েছে। এখানে রাত্রিবেলা আমরা একসঙ্গে পড়াশুনা করি এবং যেদিন সিনেমা ও থিয়েটার থাকে, সেদিন এই ঘরেই সে-সব দেখান হয়।

বাড়ীটির মাঝখানে হচ্ছে আমাদের ক্লাসরুম এবং তার দু'পাশেই হোস্টেল। স্কুলের পিছন দিকে খাবার ঘর, সেখানে প্রায় দুশো জন ছাত্র একসঙ্গে বসে খেতে পারে। স্কুলের প্রকাণ্ড এই বাড়ীর কাছে আর একটি ছোট বাড়ী আছে। এটি হচ্ছে আর্ট-রুম। এখানে ছবি আঁকা ও রঙ করা ইত্যাদি সেখানে হয়। ঘরের দেওয়ালটি ছবিতে ভরে গেছে। আমাদের স্কুল থেকে ছাত্ররা ছবি আঁকা প্রতিযোগিতায় যোগদান করে এবং অনেক সুন্দর সুন্দর ছবি এঁকে এখানে পাঠায়। এই ঘরের পাশেই হচ্ছে গান-বাজনার ঘর। এখানে বিভিন্ন রকম গান ও বাজনা সেখানে হয়। এর পাশেই হচ্ছে একটি ছোট যাদুঘর। আর্ট-রুম থেকে কিছু দূরে হচ্ছে স্কুলের মন্দির। এখানে রোজ সকালে ও বিকেলে ছেলেরা প্রার্থনা করতে যায়।

রেসিডেন্সিয়াল স্কুলের মত আমাদেরও ভোর বেলা সূর্যোদয়ের পূর্বে উঠতে হয়। অন্য স্কুলের মত এখানেও রুটিন করে খেলা ও পড়া দুই হয়। এ ছাড়া স্কুলে আরও অনেক রকম কাজ সেখান হয়।-যেমন—কাঠের কাজ, প্ল্যাষ্টিকের কাজ, ছবি প্রিণ্ট করা, তেল, সাবান ইত্যাদি তৈরী করা।

স্কুলে অনেক রকমের খেলা আছে—ফুটবল, হকি ও ক্রিকেট ছাড়া টেনিশ, সাঁতার, বাসকেট বল, সাইকেল, পোলো, বন্দুক ছোঁড় ইত্যাদি। আগে ঘোড়ায় চড়াও শেখান হোত। স্কুলের সঙ্গে বাইরের টিমের খেলা ছাড় নিজেদের দলের মধ্যেও খেলা হয়।

স্কুলের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য ঘটনা হচ্ছে, আমাদের বার্ষিক উৎসব। এই সময় কোন গণ্যমান্য লোককে প্রধান অতিথি হিসেবে নিমন্ত্রণ করা হয়। তিনিই আমাদের সব উৎসবে সভাপতিত্ব করেন। এই উৎসবটি তিন দিন ধরে চলে। এই সময়ে স্কুলের পুরনো ছাত্ররা, রাজা-মহারাজারা এবং বড় বড় অফিসাররা আসেন। তাঁরা এসে আমাদের সঙ্গে খাওয়া-দাওয়া ও খেলাধুলা করেন। তাঁদের মনরঞ্জনের জন্য থিয়েটার, নাচ, গান ইত্যাদি দেখান হয়ে থাকে।

এই পাবলিক স্কুলের মত সুবিধা অন্য স্কুলে পাওয়া যায় না। এখানে খেলা, খাওয়া ও পড়ার অনেক সুবিধা আছে। তাছাড়া এখানে ছাত্র ও মাষ্টার মশায়দের একসঙ্গে মেলামেশা খুবই আনন্দদায়ক।

শ্রীগৌতম রুদ্র

—

কবি

বসেছিলেম খাতা কলম নিয়ে
ইচ্ছে মনে,—'লিখতে কিছু হবেই ;
কাজ রয়েছে ? থাকে থাকুক গিয়ে ;
রইলে বেঁচে, কাজ তো কিছু রবেই !

তা'র তাড়াতে রাখি যদি
কাগজ কলম তুলে,
বেলালুম যে লিখতে যাব ভুলে !

মস্ত কবি হওয়ার আশা মনে,—
লিখবো বসে একলা ঘরের কোণে,—
বিশ্ব-জনায় বলবে প'ড়ে—"সাবাস !
ছন্দে-বাঁধা তিন ভুবনের আভাস।"

জানবে নাকো তারা,
লিখতে বসে. কবি, ভেবেই সারা !
শূন্য চোখে দেখে—
আকাশ জুড়ে রঙিন মেঘের নেশা,
সামনে পথের ভিড়ে
কালো-সাদায়, নীল-হলুদে মেশা ;
মেঘের গায়ে ঘুঁড়ি,—
পথের ধারে হাঁকছে ফেরিঅলা,—
ভিখারিণীর কোলে
শীর্ণ শিশু জড়িয়ে মায়ের গলা।

সন্ধ্যারাগে রাতের সাথে
দিনের হোলি খেলা,
বিদায় নেবার বেলা ;

শুনতে পেলেম, বিশ্বজনার বক্ষধ্বনি মাঝে,
মহাকালের চিরন্তনি চরণধ্বনি বাজে।
সেই ধ্বনির-ই অন্তহারা তেপান্তরের মাঝখানে
ব্যার্থ আমি বেড়াই খুঁজে
হারিয়ে যাওয়া মোর গানে ॥

শ্রীসুব্রত রায়

ময়ূর

শিল্পী : শ্রীসুশান্ত চক্রবর্তী

বুদ্ধির খেলা

শ্রীননীগোপাল চক্রবর্তী

লোক বসানো

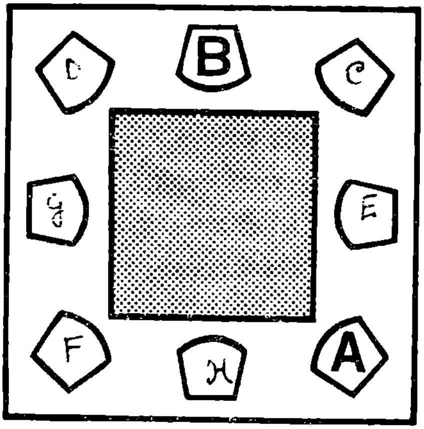

(১) একটি টেবিল ও তার চারধারে আটখানা চেয়ার আছে। A আর B দুই ব্যক্তি দু'খানা চেয়ারে বসেছে। এখনও C, D, E, F, G, H ছ'জন বসতে বাকী। D আর C কিন্তু Aকে পছন্দ করে না, আবার E এবং H Bকে পছন্দ করে না। এদিকে আবার F আর G কিন্তু A, B কাউকেই পছন্দ করে না। যারা যাকে পছন্দ করে না তারা তার কাছেই বা বসবে কি করে? ওরা তাহ'লে কিভাবে বসবে বলত?

[উত্তরটা পাবে পরের পৃষ্ঠায়]

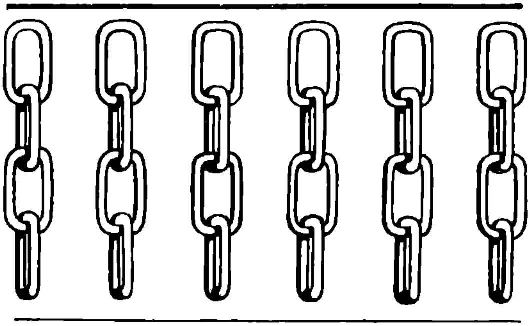

শেকল জোড়া

(২) ছ'গাছা শেকলের টুকরো আছে। ওগুলি দিয়ে একটা মাত্র শেকল করতে হবে। চারটার বেশি আংটা খুলতে পারবে না কিন্তু। কি ভাবে মাত্র চারটা আংটা দিয়ে ওগুলিকে একটা শেকল করা যায় বলত?

[উত্তর পরের পৃষ্ঠায় দেখ]

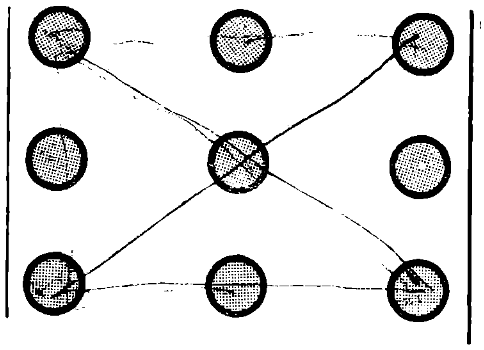

বৃত্ত-সংযোগ

(৩) ন'টা বৃত্ত আছে লাইন ক'রে সাজানো। চারটি মাত্র সরলরেখা টেনে ঐ বৃত্তগুলিকে সংযুক্ত করে দিতে হবে। সরলরেখা টানবার সময় কিন্তু কলমটি তুলতে পারবে না। কিভাবে তা সম্ভব বলত ?

(নীচের উত্তরগুলি আগে দেখে নিও না।)

* উত্তর *

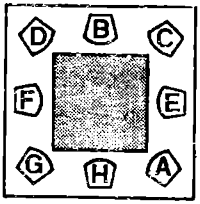

(১) ছবির অনুরূপ C, D, E, F, G এবং Hকে বসাতে হবে। পাশের ছবি দেখ।

(২) চারটে আংটার সাহায্যে পাঁচটা অংশকে জোড়া দেওয়া যেতে পারে। এইজন্য একটা শেকলের চারটে আংটা খুলে নিলে বাকী পাঁচটি খণ্ডকে একটা শেকল করা সহজ হবে।

গোটা একটা শেকল না নিয়ে চারটে শেকলের প্রত্যেকটা থেকে একটা করে আংটা নিলে ছ'টা খণ্ডকেই জোড়া দিতে হবে ; চারটা আংটার সাহায্যে তা সম্ভব নয়। এইজন্য ঐ ছ'গাছা শেকলের টুকরো থেকে গোটা একগাছা থেকে চারটে আংটা খুলে নিতে হবে।

(৩) ছবির অনুরূপ সংযোজক সরলরেখা টানতে হবে। তীরচিহ্ন দিয়ে সরলরেখাটি কলম না তুলে কিভাবে যাবে তা' দেখান হয়েছে পাশের ছবিতে।

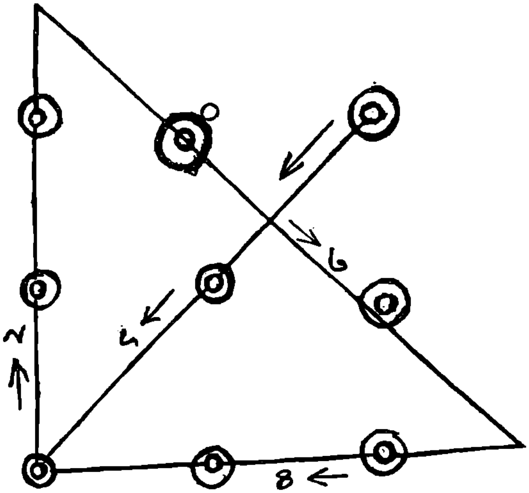

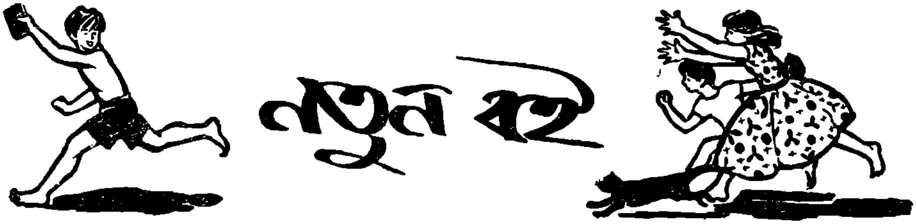

(সমালোচনার জন্য দু'খানি বই পাঠাবেন)

আমার মা—শ্রীশৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়। এসোসিয়েটেড পাবলিশার্স, এ৯ কলেজ স্ট্রীট মার্কেট, কলিকাতা ১২। মূল্য ১'৬০

মামা, ভাগনে ও মা'র ব্যাপার নিয়ে সুন্দর লেখা ছোটদের উপন্যাস। মামা বড় লোক; সেই মামার বাড়িতে বিনু তার মাকে নিয়ে গিয়ে ওঠে অবস্থাগতিকে। তারপর সেখানে মামিমার সঙ্গে তাদের অসন্তোষ সৃষ্টি হয়, কিন্তু মামার আগ্রহে ও ভালবাসায় তারা থেকে যায় ঐ মামার বাড়িতে, এবং মামিমা বাপের বাড়ি চলে যায়। বিনুর মা'র এতে স্বস্তি হয় না, তিনি ছেলের উপরই দোষারোপ করতে থাকেন এবং শেষ পর্যন্ত কাশী চলে যান। শেষে মামার মৃত্যু হলে মামিমার সঙ্গে মামলা-মকদ্দমার পর সমস্ত সম্পত্তি ও ঐশ্বর্য আসে বিনুর হাতে। মামলায় জিতে টাকা হাতে পেয়ে বিনু কাশী থেকে মাকে যখন আসতে যায় তখন মা তার মারা গেছেন। পয়সার প্রতি লোভ সম্বন্ধে মৃত্যুর পূর্বে মা বিনুকে একখানি সুন্দর চিঠি লিখে যান। কাহিনীটি ভারী সুন্দর। বইখানির ছাপা, বাঁধাই ও কাগজ সুন্দর। মলাটটিও আকর্ষণীয়।

—

বাহাদুর—শ্রীননীগোপাল মজুমদার। রিভ্যু পাবলিশার্স, ১৬।১৭, বীরেন রায় রোড ইষ্ট, কলিকাতা-৮। মূল্য ২৲

বিকাশ, সহায়রাম, প্রভৃতিদের নিয়ে সোনা তৈরীর বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি যা বিকাশবাবু বার করেছিলেন, তা রবার্টসন নামক একজন সাহেব চুরি করে জেনে নেবার চেষ্টা করে, সেই চেষ্টার উপরই এই উপন্যাসের ভিত্তি। ডিটেকটিভ আছে এর মধ্যে, কাজেই ডিটেকটিভ উপন্যাসও বলা যায় বইখানিকে। 'বাহাদুর'-এর মধ্যে দুটি খণ্ড আছে। প্রথম খণ্ড উপরের কাহিনী নিয়ে। দ্বিতীয় খণ্ডের রক্ত-কৃপাণ। এটি কিন্তু সত্যিকারের রোমাঞ্চকর কাহিনী এবং প্রথমটির চেয়েও বেশী আকর্ষণীয়। ভিতরে কয়েকখানি ছবি আছে।

—

নোটন নোটন—বিশ্বনাথ দে। শ্রীপ্রকাশনী, ৬২ আমহার্ষ্ট স্ট্রীট, কলিকাতা ৯। মূল্য ১৲

কিণ্ডারগার্টেন নার্শারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ে পড়ার উপযোগী যুক্তাক্ষরবর্জিত ছবি ও ছড়ার বই। নোটন নোটন শব্দ দুটি নিয়ে শেষে একটি ছড়া আছে। বাকী ছোট ছোট ছড়াগুলির অধিকাংশই ছোটদের ভাল লাগবে এবং তার ছবি দেখে ও ছড়াগুলি পড়ে প্রভূত আনন্দ পাবে।

—

নতুন বই ঃঃ

সাত ভাই চম্পা—সমর চট্টোপাধ্যায়। শিশু রঙমহল প্রকাশনীপক্ষে শ্রীমীরা সুর কর্তৃক২,তিলক রোড,কলিকাতা ২৭ হইতে প্রকাশিত। মূল্য২·৫০

'সাত ভাই চম্পা জাগো রে, কেন বোন পারুল ডাকো রে' রূপকথার রাজ্যে একটি অতি পুরাতন অথচ চির-নবীন কাহিনী। এই কাহিনী ছোটদের জন্যে অভিনয় করার মত নাটকে রূপান্তরিত হয়েছে। ইতিপূর্বে শিশু-রঙমহলে এটি কৃতিত্বের সঙ্গে অভিনীত হয়ে ছোট-বড় সকল দর্শকদেরই খুশি করে। এর মধ্যে চরিত্র হিসাবে সাত ভাই চম্পা, পারুল বোন, মা ষষ্ঠী ও মালীরা আছে। এছাড়া আরও আছে রাজা, মন্ত্রী এবং সুয়োরাণী ও দুয়োরাণী। কথা দিয়ে, ছড়া, গান ও গানের স্বরলিপি দিয়ে এবং তারও উপর পাতায় পাতায় অজস্র দু'রঙের ছবি দিয়ে বইখানিকে ছোটদের কাছে খুবই আকর্ষণীয় করে তুলেছেন গ্রন্থকার। —

নিজে কর—শ্রীমহেন্দ্রনাথ দত্ত ও শ্রীপ্রদ্যোত দত্ত। শিশু সাহিত্য সংসদ প্রাইভেট লিঃ ৩২এ আপার সার্কুলার রোড, কলিকাতা ৯ হইতে প্রকাশিত। মূল্য ৮০

লোয়ার ইনফেণ্ট ও কে. জি. ওয়ানের উপযোগী সংখ্যা শেখার বই যে এমন সুন্দর করে বাংলায় করা যায় তা না দেখলে বোঝান যাবে না। ছড়া দিয়ে আর প্রতি পাতায় শিল্পী নরেন্দ্রনাথ দত্তর সুন্দর আঁকা ছবিগুলি দিয়ে এক থেকে দশ পর্যন্ত সংখ্যা এবং তার যোগ-বিয়োগ শেখান হয়েছে। তারপর নামতাও কিছু অংশ আছে। বইখানি আগাগোড়া দেখবার মত। ছোটরা সহজেই সংখ্যাগুলি শিখে যাবে।

আমাদের কথা

আবার একটি বছর শেষ হয়ে গেল এই সংখ্যার সঙ্গে। মৌচাক আগামী বৈশাখ ১৩৬৬ সালে ৪০ বছরে পড়বে। ৪০ বছর একটানা চলে আসা একটি শিশু-মাসিকপত্রিকার জীবনে কম গৌরবের কথা নয়!

আগামী বছর থেকে মৌচাকের বর্ষিক মূল্য ৫৲ ও ষণ্মাসিক মূল্য ২৷৷০ করতে হয়েছে। প্রধানতঃ ছাপা ও কাগজের অতিরিক্ত দাম বাড়ার জন্যেই এই ব্যবস্থা করতে হয়েছে। তবে এর জন্যে নতুন বছর থেকে মৌচাককে নানাভাবে ভাল করারও আমরা চেষ্টা করছি। কাজেই আমরা আশা করব, এই সামান্য দাম বাড়ার জন্য মৌচাকের সঙ্গে তোমাদের দীর্ঘদিনের যে সম্পর্ক বজায় আছে, তা কোন অংশেই ক্ষুণ্ণ হবে না।

এই সংখ্যার সঙ্গে যাদের বার্ষিক বা ষাণ্মাসিক চাঁদা শেষ হ'ল, তারা সম্ভব হলে যত তাড়াতাড়ি পারো আগামী বছরের চাঁদা মনি-অর্ডার যোগে পাঠিয়ে দিয়ো। এতে অনেকটা খরচ বাঁচবে। আর যারা তা পারবে না, তাদের আমরা বৈশাখ সংখ্যা ভিঃ পিঃ ডাকযোগে পাঠিয়ে দেব। তবে তা ফেরত দিয়ে আমাদের ক্ষতিগ্রস্ত করার চেয়ে বরং যাদের গ্রাহক গ্রাহিকা থাকার অসুবিধা আছে, তারা একখানি পোষ্টকার্ডের সাহায্যে আমাদের জানিয়ে দেবে।

—

শ্রীসুধীরচন্দ্র সরকার কর্তৃক ১৪ বঙ্কিম চাটুজ্যে ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১২ হইতে প্রকাশিত
ও তৎকর্তৃক প্রভু প্রেস, ৩০ কর্নওআলিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৬ হইতে মুদ্রিত।
মূল্য ঃ চল্লিশ নয়া পয়সা

মৌচাক

ছেলেমেয়েদের সচিত্র মাসিকপত্র

শ্রীসুধীরচন্দ্র সরকার সম্পাদিত

[৩৯ বর্ষ, ১৩৬৫]

বর্ণানুক্রমিক সূচী

লেখার নাম	লেখক	পৃষ্ঠাঙ্ক
অভয় মন্ত্রের মহিমা	শ্রীহেমেন্দ্রকুমার রায়	২২১
আগুন পাড়ার মাঠ	শ্রীদরদিন্দ্রকুমার রায়	১৪৯
আচার্য যদুনাথ		১০৮
আজব শহর	শ্রীগোপাল ভৌমিক	৩৬৭
আজি এই শরতে	শ্রীরমেন চৌধুরী	৪২২
আমার গ্রাম	শ্রীঅপূর্বকৃষ্ণ ভট্টাচার্য	১৮২
আমাদের কথা		৬২৬
আরও সূর্য আরও সৌরজগৎ	শ্রীপুলকেশ দে সরকার	৪৬
ইন্দোচীনের চিঠি	শ্রীঅজিতকুমার তারণ	১৯৫
উচিত-জবাব	শ্রীফণিভূষণ বিশ্বাস	১৪৭
উশ্রী দর্শনে	শ্রীকালীপদ গঙ্গোপাধ্যায়	২৭
এই সংসার স্বপ্ন নয়	শ্রীজিতেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়	৫৫৬
একটি সাঁওতালী উপকথা	শ্রীরাণা বসু	১৫৫
একতা	শ্রীসুধীভূষণ ভট্টাচার্য	১৩২
একতারার গান	শ্রীঅচ্যুত চট্টোপাধ্যায়	২৩২
একলার কান্না	শ্রীউমা রায়	৫৮৫
এঁকে চেন কি		৫২৪
এমন কিছু আঁকতে পারো ?		৭৫
এলিফ্যাণ্টা গুহা	শ্রীউত্তরা সেন	৫৫৭
কন্যাকুমারী	শ্রীরামপদ মুখোপাধ্যায়	৯৯
কম্পোষ্ট সার		৯৩
কস্তুরী মৃগ	দেবাচার্য	২৮, ৭৬, ১৩৭, ১৮৩, ২৩৩, ২৮৭, ৪০১, ৪৪৫, ৫০৩, ৫৪৯, ৬০৫
কাঁকড়া	শ্রীনবকুমার ভট্টাচার্য	২৯৬
কাকাতুয়া	শ্রীবিভুপ্রসাদ বসু	৪৮৬
কাগজের আবিষ্কার	দিগ্‌গজ শর্মা	৫৫
কানহেরি গুহা	শ্রীধীরেন্দ্রলাল ধর	৩৫৪
কার ঠাট্টা	চিত্রভানু	৪৯৯
কালো চোখো মেয়ে	শ্রীগোপা দত্ত	৫৬৩
কালো বিড়াল	"মুসাফির"	৫১২
কাশীর পেয়ারা	শ্রীদীনেশ গঙ্গোপাধ্যায়	১১৯
কাহিনী	শ্রীসুনীলকুমার বসু	৬১০
কি খাই	শ্রীপরিমল রায়	১৮৬
কুরুক্ষেত্র	শ্রীশক্তিপদ রাজগুরু	২৭৭

লেখার নাম	লেখক	পৃষ্ঠাঙ্ক
কৃতজ্ঞতা	শ্রীদুর্গাদাস মুখোপাধ্যায়	৬০১
কোষ্ঠী বিচার	বন্দে আলী মিয়া	৪৩৫
ক্যালেণ্ডারের পাতা নিয়ে মজার খেলা		২৫০
ক্রৌঞ্চ ক্রৌঞ্চি পালা	অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর	৩২৭
ক্ষুদ্র বটে তুচ্ছ নয়	বিজ্ঞানপ্রিয়	১৯২
খেলাধুলার খবর	মেঠুড়ে	৬১, ১০৯, ১৫৭, ২০০, ২৬০, ৩০৮, ৩৭৬, ৪২৫, ৪৮২, ৫২৫, ৫৭৯, ৬১৭
খোকন বাবু	শ্রীরণজিৎকুমার সেন	৩৫৯
গতিই জীবন	শ্রীঅমরেন্দ্রনাথ দত্ত	৪১৯
গরমের ছুটি	শ্রীবিমল দত্ত	৬৫
গল্প নয়	শ্রীসৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়	৫৯৩
গোঁফ খেজুরে ভাই	শ্রীরাজকুমার মুখোপাধ্যায়	৫১৬
গ্যাস-বেলুন	'নিরঙ্কুশ'	৩৪২
গ্রাহক গ্রাহিকা সংখ্যা	সম্পাদক	৫৩৫
গ্রাহক-গ্রাহিকাদের লেখা		৫৭ ২০২, ২৬২, ৩১৭, ২৪৭, ৫২৮, ৬২০
ঘড়ির কাঁটা	শ্রীসুশীল রায়	৩৩৮
ঘরের ভিতর বাগান	শ্রীপশুপতি ভট্টাচার্য	৩৩৯
চাতক	শ্রীনির্মলকুমার চক্রবর্তী	৫৭০
চাঁদ আমাদের কে ?	শ্রীপুলকেশ দে সরকার	১৭৮
চাঁদ যাবে ভেঙ্গে		৬৯৮
চিঠি	শ্রীকামাক্ষীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়	৩৯,৭৩,৪৪৩
চিদাম্বরম	শ্রীঅমিতাভ ত্রিপাঠী	৫৬৯
চির আঁধারের রাজ্যে	বিজ্ঞানপ্রিয়	২৩
চীৎকার	শ্রীমধুসূদন চট্টোপাধ্যায়	৪৫২
ছড়া	শ্রীপরিমল রায়	৪৯৮
ছড়া	শ্রীবীরু চট্টোপাধ্যায়	৩৯৭
ছড়ার সুরে পড়ো	শ্রীবিশ্বনাথ দে	২৩৬
ছাতা ও জুতা	শ্রীবাণীকুমার	২৬৯
ছাপাখানার কথা	দিগ্‌গজ শর্মা	১৫৩
ছি ছি-ছি	পরিমল রায়	১১৮
ছোটদের জন্য ম্যাজিক	এ. সি. সরকার	৫৩
ছোট্ট একটি ঘড়ি	শ্রীসতীকুমার নাগ	৫০৮
জগদীশচন্দ্র	শ্রীযোগেশচন্দ্র বাগল	৪৬৮
জন্মদিন	শ্রীশিউলি গুপ্ত	২৪৫
জাগছে গাধার চেতন	শ্রীকল্যাণী চক্রবর্তী	৫৭৮
জান কি ?		১৬১
জ্যৈষ্ঠের ছড়া	শ্রীপ্রভাকর মাঝি	৮০
জোনাকি	শ্রীসন্তোষকুমার মুখোপাধ্যায়	৫৬৮
জোয়ার ভাটার ইন্দ্রজাল	ননীগোপাল চক্রবর্তী	৫১০
টিপলু বাবু	শ্রীপ্রেমেন্দ্র মিত্র	৬১
টিয়া	শ্রীসুশীলকুমার গুপ্ত	৪১
টেস্ট ম্যাচে সেরা বোলার	শ্রীবিনয় মুখোপাধ্যায়	৫৯৭
টোপাকুল	শ্রীদীনেশ গঙ্গোপাধ্যায়	৪৮৫
ট্রয়ের সন্ধানে	বিজ্ঞানপ্রিয়	৪৫৯
ডুগগু বা সিন্ধু-গব	শ্রীহিতেন্দ্রমোহন বসু	২৫১
তাজমহলের রত্নালঙ্কার	শ্রীহেমেন্দ্রকুমার রায়	৩৭২
তাসের হাইজাম্প	শ্রী এ. সি সরকার	৪৯৭
তিনভাই ও ডাইনী	শ্রীনীহার ঘোষ	১৪২
তিরুপতি বালাজী	শ্রীরামপদ মুখোপাধ্যায়	৪০৬

লেখার নাম	লেখক	পৃষ্ঠাঙ্ক
তুলসী খাও	ডাঃ শচীন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত	৬১৫
তুমি আমায় বক্‌বে কি মা ?	শ্রীঅপূর্বকৃষ্ণ ভট্টাচার্য	৫০৭
তোমরাও এমনি হতে পারো	শ্রীনরেন্দ্রনাথ সিংহ	২৮৩
দক্ষিণ মেরু ও উত্তর মেরু	সন্ধানী	২৯৫
দাড়ি-মেধ	সত্যবান	২৯৭
দানবীর	শ্রীবিমলকুমার ঘোষ	৩০৫
দুনিয়াকে যে হাসাচ্ছে আজও	শ্রীগজেন্দ্রকুমার মিত্র	৩৪৩
দুয়োরাণীর ছেলে	শ্রীবীরু চট্টোপাধ্যায়	২১৩
ধাঁধার পাতা		৫৯, ১৫৯, ২০৭, ২৬৪, ৩১১, ৩৭৯, ৪২৩ ৪৭৯, ৫৮১, ৬২৩
নতুন পড়া	শ্রীরণজিৎকুমার সেন	১০৫
নতুন বই		৬২, ১১৪, ১৬২, ২০৬, ৩১৪, ৩৭৮, ৪৩১, ৫৩৩, ৬২৫
নববর্ষ উৎসবে জাপান	শ্রীসুধাংশু ভট্টাচার্য	১৩৪
নববর্ষের গান	ফটিক বন্দ্যোপাধ্যায়	৫৪
পটল তোলার আগে	শ্রীপতিতপাবন বন্দ্যোপাধ্যায়	৩৪৮
পরিচয়	শ্রীনগেন্দ্রকুমার মিত্রমজুমদার	১৭২
পর্বত ও মূষিক	শ্রীহেমেন্দ্রকুমার রায়	৯
পাখিরা	শ্রীসুনীল বসু	৯৪
পারস্যের সভ্যতা	শ্রীবিমলপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়	৩৬৪
পার্সিয়ুসের কাহিনী	শ্রীরজতকান্ত রায়	৫৭১
পিণ্টুবাবু	শ্রীবিভা সরকার	৫৯৫
পুজোর বাঁশি	শ্রীঅনিলেন্দ্র চৌধুরী	৪০৫

লেখার নাম	লেখক	পৃষ্ঠাঙ্ক
পূজার গল্প	শ্রীনরেন্দ্রনাথ মিত্র	৩৮৯
প্রজাপতির সাজ	শ্রীবীরেন্দ্রকুমার ভট্টাচার্য	১৩১
প্রতীক্ষা	শ্রীপার্থ ও সিদ্ধার্থ দত্ত	৫৪৭
প্রশ্ন	শ্রীমধুসূদন চট্টোপাধ্যায়	৬১৬
প্রাইজ	শ্রীঅতসী চৌধুরী	২৫৬
প্রাচীনদের প্রতি	শ্রীমধুসূদন চট্টোপাধ্যায়	১১৩
প্রার্থনা	শ্রীইলা সরকার	৫৬৬
প্রেমেন্দ্র মিত্র	শ্রীভবানী মুখোপাধ্যায়	১৩
ফুল ফুটলো	শ্রীহিমালয়নির্ঝর সিংহ	৩০৭
ফুলের মাঝে নিতু	নিরঙ্কুশ	৫০৯
বচনে নয়	শ্রীপরিমল রায়	৩৮৮
বড়-মা	শ্রীঅসমঞ্জ মুখোপাধ্যায়	৩৪৯
বন্ধু	শ্রীসুশান্ত চক্রবর্তী	৫৪৩
বর্ষাদিনের ছোটপাখী	শ্রীসুলতা কর	৪৯৩
বহুরূপী	শ্রীবিমল দত্ত	৪ ৮
বায়স্কোপে কার্টুন-চিত্র	দিগ্‌গজ শর্মা	৫২১
বিজ্ঞানের কথা	বিজ্ঞানী	৫১৮
বিদ্রোহী কিশোর	শ্রীপ্রভাকর মাঝি	৪৫৮
বিপিনচন্দ্র	শ্রীঅশোক গুহ	৪৭৪
বিষম-সঙ্কট	শ্রীঅবনীভূষণ চট্টোপাধ্যায়	১৩৬
বিষ্টিপড়ে	শ্রীবিভুপ্রসাদ বসু	১৬৫
বীরেশ্বর বিবেকানন্দ	শ্রীঅচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত	৩, ৬৭, ১১৯, ১৬৭, ২১৫, ২৭১, ৩২১, ৩৮৩, ৪৩৭, ৪৮৭, ৫৩৭, ৫৮৭
বুড়ীর বাজার	শ্রীগোপাল ভৌমিক	৬০২
বুদ্ধি ও উপস্থিত বুদ্ধি	শ্রীঅসমঞ্জ মুখোপাধ্যায়	৪৯
বুদ্ধির খেলা	শ্রীননীগোপাল চক্রবর্তী	১১১ ৪০৩

লেখার নাম	লেখক	পৃষ্ঠাঙ্ক
বুলবুলি	শ্রীবীরেন্দ্রকুমার ঘোষ	২৩০
বৃকাসুরের পুনর্জন্ম	বিজ্ঞানপ্রিয়	৮১
বেজায় বেভুল	শ্রীপরিতোষকুমার চন্দ্র	২৪৪
বেদ	শ্রীমহুয়া বিশী	৫৫৯
বেলা শেষে	শ্রীঅনুরাধা বসু	৫৪৬
বৈশাখী ভাবনা	শ্রীগোপাল ভৌমিক	১৬
বোকার চেয়ে বোকা	শ্রীমিলাডা গঙ্গোপাধ্যায়	৩৩৫
বোম্বাই	শ্রীধীরেন্দ্রলাল ধর	২৩৭
ব্যর্থ-প্রয়াস	শ্রীঅশোকা দাশগুপ্তা	৫৬৭
ভক্ত-হস্তী পারিলেয়ক	শ্রীরেখা চট্টোপাধ্যায়	২৯১
ভবিষ্যৎ-বাণী	শ্রীইন্দিরা দেবী	৪৬৬
ভাষার গল্প	শ্রীসুধীভূষণ ভট্টাচার্য	৪১৫
ভেস্তা	শ্রীপ্রেমেন্দ্র মিত্র	১
ভোম্বল	শ্রীমধুসূদন চট্টোপাধ্যায়	৩৭১
মধুচক্র	মধুদি	৬৩, ১১৫, ১৬৩, ২১১, ২৬৬, ৩১৭, ৪৩৪, ৫৮৩
মহাপুরুষ মহম্মদ	মুসাম্মৎ অহেদা খাতুন	৫৭৭
মাকড়সার কীর্তি	শ্রীসৌরীন্দ্রমোহন মুখোঃ	১৮৭
মাটি চাপা ইতিহাসের অধ্যায়	বিজ্ঞানপ্রিয়	২২৭
মাধুরামের মাদুলী	স্বপনবুড়ো	৩৬০
মুক্তি	শ্রীপ্রবোধকুমার সান্যাল	৩২৮
মেকি চাঁদ	শ্রীসুশীল রায়	৩৩
মেঘ	শ্রীসুধীভূষণ ভট্টাচার্য	২৩১
মৌচাক	শ্রীআশুতোষ সান্যাল	৫২
মৌ-চোর	শ্রীরেবতীভূষণ ঘোষ	১১৩
রাজা ও জ্ঞানী	শ্রীসৌরীন্দ্রমোহন মুখোঃ	৩৮১
রাতের বৃষ্টি	শ্রীমধুসূদন চট্টোপাধ্যায়	২২৬
রূপদক্ষ রূপলাল	স্বপন বুড়ো	৪২
রেডিও-একটিভ ইস্কুল	শ্রীপতিতপাবন বন্দ্যোপাধ্যায়	১৫২
রোগ পালাল কিল চড়ে	শ্রীপরিমল রায়	১৫
লক্ষ্যভেদ	শ্রীপরিমলকুমার চন্দ্র	৯৫
শর্টকাট্	শ্রীশিবরাম চক্রবর্তী	৪৫৩
শারদীয়া	শ্রীদীনেশ গঙ্গোপাধ্যায়	৩১৯
শালিক শালিক	শ্রীপলাশ মিত্র	২৮২
শিক্ষার আদর্শ	শ্রীঅরুণকুমার দে	৫৭৭
শিয়াল রাজা	শ্রীমোহিনীমোহন গাঙ্গুলী	৫৭৬
শিশুক	শ্রীহিতেন্দ্রমোহন বসু	১৮১
শীতদিদি	শ্রীস্বদেশরঞ্জন দত্ত	৪৭৮
সত্যি ছড়া	বিমানচাঁদ মল্লিক	২৯৪
সদাশিবের অগ্নিকাণ্ড	শ্রীশরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়	৮৯,১২৫,১৭৩
সদাশিবের আদিকাণ্ড		১৭
সম্ভর হ্রদ	শ্রীঅপূর্বরতন ভাদুড়ী	৮৫
সাগর পারের চিঠি	শ্রীদেবীপ্রসাদ বন্দোপাধ্যায়	৫০২
সামান্য ভুল	শ্রীনরেন্দ্র দেব	৩৩৪
সাহেবের হোটেল	শ্রীপুষ্প বসু	৪১১
সেয়ানে সেয়ানে	শ্রীশচীন্দ্রনাথ অধিকারী	৬১১
স্নায়ুর কাজ	শ্রীকমল বন্দোপাধ্যায়	১০৬
স্মৃতিরেখা	শ্রীঅবনীনাথ রায়	৪৫১
হ-জ-ব-র-ল	শ্রীআশুতোষ সান্যাল	৪৫০
হাওয়া	শ্রীসুশীলকুমার গুপ্ত	৩৫৩
"হিতোপদেশ"-এর উপদেশ		৪৬৫
হোঁদল	শ্রীঅন্নদাশঙ্কর রায়	৩২৫